বাসুদেব মাইতি

স্বয়ংবর

প্রকাশ করেছেন :

শ্রীপিনাকীরঞ্জন রায়

ইউনিভারস্যাল পাবলিশার্স

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলকাতা—৬

ছাপিয়েছেন :

শ্রীহরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস

১৬০, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট

কলকাতা—৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :

শিল্পী শ্রীদাশরথী পাল

প্রথম প্রকাশ :

ফাল্‌গুন, ১৩৫৮

দাম : এক টাকা বারো আনা

পরিচায়িকা

শ্রীমান বাসুদেব মাইতি আমার ছাত্র। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুরাগের প্রমাণ পেয়েছিলাম যখন তিনি আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে যোগদান করলেন। পরে জানলাম বাসুদেব শুধু সহৃদয়ই নন, তিনি সাহিত্য-স্রষ্টাও। সাময়িক পত্রিকায় ছোট গল্প লিখে তিনি পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর দু' একটি লেখা আমিও পড়েছি। তাই যখন শুনলাম যে, 'স্বয়ংবর' নামে তাঁর ছোট গল্পের একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তখন আনন্দিত না হয়ে পারিনি। সাহিত্যের অধ্যাপকের কাছে সাহিত্যিক-ছাত্র চিরদিনই বিশেষ আদরের।

প্রাঞ্জল ভাষায় রচনাকে হৃদয়গ্রাহী করবার ক্ষমতা বাসুদেবের আছে। গল্পের বাঁধুনি ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পূর্ব সূরিদের প্রভাব এখনো তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। নবীন শিল্পীর প্রাথমিক যুগের রচনায় তা পারা সম্ভবও নয়, বরং ঐতিহ্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারা গুণেরই বিষয়। বাসুদেব যদি নিষ্ঠার সঙ্গে এই পথে সাধনা ক'রে যান তাহলে একদিন আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধতম এই দিকটি তাঁর ভাণ্ডার থেকেও কিছু গ্রহণ ক'রে গৌরবান্বিত হ'তে পারবে। তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সুন্দর হোক্!

বঙ্গবাসী কলেজ
বাণীবন্দনাপক্ষ, ১৩৫৮

জগদীশ ভট্টাচার্য

মুখ-কথা

রাষ্ট্রনেতৃত্ব পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণটাই জাতীর জীবনে ভয়ংকর মর্মান্তিক, আর এই মর্মান্তিক সংকটকালের প্রধান বলি—রোমাঁ রোলার মতে—শিল্পী ও সাহিত্যিক। কী রাজনৈতিক, কী আর্থিক, কী সামাজিক—সব দিক দিয়ে আজ আমরা এক চরম সংকটময় অবস্থায় উপস্থিত। আমাদের আর্থিক কর্তৃত্ব এখনও ধনীর হাতে বিদ্যমান; কিন্তু রাষ্ট্রনেতৃত্ব ক্রমশঃ কৃষক-মজুরের হাতে অপস্রিয়মান। উপরের চাপে এবং নীচের তাপে বাঙলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ পিষ্ট, গলিত। আর বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিক মূলতঃ এই মধ্যবিত্ত সমাজ-জাত। সুতরাং এই মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত সমাজ-জাত শিল্পী-সাহিত্যিক যে জাতীর শ্রেষ্ঠ বলি হবে— তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

আজকে আমাদের এই সংকটক্ষণের খ্যাতিমান প্রাচীন শিল্পী-লেখকদের অবস্থাই যখন কাহিল, তখন নবীন অখ্যাত শিল্পী-লেখকদের যে জন্মমাত্রে বলিদান হবে—তা বলাই বাহুল্য! তবুও নবীন শিল্পী-লেখকের দল চালনা করে চলেছেন তাঁদের তুলী ও লেখনী; কারণ সেটাই শিল্পী-লেখকদের—তাঁরা প্রাচীনই হোক আর নবীনই হোক—স্বভাবধর্ম।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির কয়েকটী ও কয়েকটি নূতন গল্পের সমন্বয়ে এই সংকলন-গ্রন্থ। গল্পগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে পৌরাণিক কাহিনী থেকে শুরু করে আগামী যুগের সম্ভাব্য ঘটনা থেকেও। গল্পগুলি যদি পাঠকের চিত্তে সামান্যতম আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলেই গল্পগুলির সার্থকতা।

বাঙলা ছোট গল্পের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা-সমালোচক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য বাঙলা-সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি এই নবীন লেখকের ও এই সামান্য পুস্তকের একটী সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা রচনা করে দিয়েছেন। তাঁর লিখিত এই পরিচায়িকা লেখক ও পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে এই অবসরেও আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

কবিবন্ধু গোরাচাঁদ জানা, সাহিত্যিক বন্ধু রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বন্ধুবর ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমান বিদ্যুৎবরণ বেতাল এবং সত্যনারায়ণ প্রেস ও ইউনিভারস্যাল পাবলিশার্সের কর্তৃপক্ষ এই পুস্তক প্রকাশনে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যত্নবান থাকা সত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ দোষ রয়ে গেল, সেজন্য পাঠকদের কাছে ত্রুটী ভিক্ষা চাচ্ছি। ইতি।

বিনীত
বাসুদেব মাইতি

'পুরাণো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি—'

—রবীন্দ্রনাথ

পরম শ্রদ্ধাভাজন

আজীবন স্বদেশকর্মী

চিরকুমার

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত প্রামাণিক

বি-এ, বি-এল, এম-এল-এ

মহোদয়ের করকমলে।

এই গ্রন্থের গল্পগুলি :—

বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ

[পুরাণে বর্ণিত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বকাহিনী সর্বজনবিদিত। তাঁদের দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে বিশ্বামিত্র দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে নূতন পৃথিবী সৃষ্টির তপস্যা জুড়েন। দেবতাদের চক্রান্তে স্বর্গের লাস্যময়ী অপ্সরী মেনকার দ্বারা তাঁর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। মেনকা কেমন করে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করেন—সেকথা পুরাণ-পাঠকের জ্ঞাত। এখানেও তাই বর্ণিত হয়েছে—কিন্তু নূতন দৃষ্টিতে। এখানে এটী মূলতঃ গল্প এবং এর বিশেষত্ব আধুনিক মন ও মনন।]

আকাশচুম্বী নীলকণ্ঠ ধবলগিরি—তার মস্তকোপরি শুভ্রতুষার-কিরীট, কটিদেশে তরুশ্রেণীর নীলাম্বর। দূর সম্মুখে পাহাড়-শ্রেণী, দেওয়ালের মত চড়াই পাহাড়। তারই মধ্যে নীলবসনা অলকানন্দার কোলে গৈরিকবসনা ধবলীগঙ্গা আত্মসমর্পিতা। পাহাড়ের অন্তস্তল দিয়ে তাদের মিলন-প্রবাহ কলস্বনমুখর—প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণ সম্পাতে তাদের মিলন দৃশ্য রোমাঞ্চকর নয়নাভিরাম। শ্বেত, হরিদ্রা, গোলাপী, নীল মার্বেল পাথরের সমাবেশে স্থানটী অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত, আরো নয়ন-মুগ্ধকর। তারই এক শ্বেত প্রস্তরোপরি পদ্মাসনে ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্র, ঠিক ঐ প্রস্তরের মত নিথর স্পন্দনহীন—যেন কোনো সুনিপুণ ভাস্কর নির্মিত এক অপূর্ব মর্মর মূর্তি।

শীতের অবসানে ঘটেছে বসন্তের আগমন। চেতনাহীন হিমালয়-অরণ্যে এসেছে প্রাণ-প্রাচুর্য। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণের প্রাণবন্ত হওয়ার মত প্রখর সূর্যকিরণ স্পর্শে মৃত্যু-কঠিন স্থাবর বরফ হয়ে

উঠেছে প্রাণবন্ত—দয়িত-সন্ধানে প্রসূতি-কোল কলস্বনমুখরিত করে চলমান। প্রেমিকের আলিঙ্গনে প্রেমিকার প্রেমকাতর হৃদয়পুলকে দুরু দুরু কেঁপে ওঠার মত বসন্ত-সমীরণে অরণ্যের তরুলতা আনন্দে হিল্লোলিত: প্রেমিকের চুম্বনে চুম্বিতা প্রেমিকার হৃদয়-কোরকের পাপড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার মত মলয়ানিল-চুম্বনে তরুলতা পত্রপুষ্পে বিকশিত। বাসন্তিক প্রকৃতির এই যৌবন-চঞ্চল উচ্ছল-গতি যেন বিশ্বামিত্রের ধ্যান মূর্তির কাছে প্রতিহত, স্তব্ধ। হিমালয়ের সমস্ত কাঠিন্য, সমস্ত সংযম যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত। গ্রীষ্মের গর্মি, বর্ষার বর্ষণ, শীতের শৈত্য—প্রকৃতির নানারূপের আনাগোনার কাল, তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের প্রভাব তাঁর চেতনায় ধরা পড়েনি। তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। এমনিভাবে চলে গেছে কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শীত, কত বসন্ত; কিন্তু আজিকার এই বসন্তে নারীকণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীতে, মনঃশীলার সেঁকো গন্ধে বাহ্য জগত সম্বন্ধে ফিরে এলো তাঁর চেতনা, চিত্ত তাঁর হল চঞ্চল। তিনি চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করলেন, দেখলেন সম্মুখে এক রমণী—

মৃগলোচনা—সে-আঁখিতে বিশ্বের রহস্য,
বেণুনাসা—সে-নাসিকায় সঙ্গীতের সুর-লহরী,
বিম্বোষ্ঠ—সে-ওষ্ঠাধরে পুরুষের কামনা-বহ্নি,
সিন্দুরগণ্ড—সে-গণ্ডে বিশ্বের কামনা,
মরালগ্রীবা—সে-গ্রীবায় উদ্দেশ্যের সাফল্য,
কালবৈশাখীর মেঘসম কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশদাম—সে-কেশগুচ্ছে যৌবনের উন্মত্ততা,
পত্রলেখা-উরসে উন্নত উরসিজ—সে-উরসিজে পুরুষের বক্ষ-রক্তের উন্মাদনা,
অশ্বকটি—সে-কটিতে আলিঙ্গনের আহ্বান,

গজজঘন—সে-নিতম্বে সৃষ্টির মাদকতা,
হংসপদিকা—সে-পদে নৃত্যের তরঙ্গিমা।

তপস্বী বিশ্বামিত্র চক্ষু আর একটু বিস্ফারিত করলেন।

সুদীর্ঘ সাধনকালে কোন মানব-মানবীর এখানে আগমন তাঁর স্মৃতি-পটে পড়ছে না—মানুষের আগমন তো এখানে সম্ভবপর নয়, তবে...?

তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ হলেন।

আর মেনকার বিলোল-হিল্লোল কটাক্ষ হ'ল ম্রিয়মান, কামনাস্ফুরিত ওষ্ঠাধর হল ম্লান। সারাদিনের আপ্রাণ চেষ্টায় এই অপরাহ্ন বেলায় তিনি বাহ্যজ্ঞানরহিত বিশ্বামিত্রের চেতনা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর আবার নেত্র মুদ্রিত হওয়ায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল বৃদ্ধাতিতম বৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মার সেদিনের করুন মুখচ্ছবি। দেবদরবারে বিশ্বামিত্রের তপস্যার কথা ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ ঋষি নারদের বিবৃতিদানের পর বিষ্ণুর কাছে তাঁর সেই লাঞ্ছনার দৃশ্যটী!

বিরক্তিতে বিষ্ণু পিতামহ ব্রহ্মাকে সেদিন বলেছিলেন, তিনি স্বয়ং যে-রেটে পৃথিবীতে জীবসংখ্যা বাড়াচ্ছেন, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থেকে তাদেরই খাদ্য যোগাতে তিনি প্রাণান্তকর; তার উপর বিশ্বামিত্রের পৃথিবীর জীবদের খাদ্য-যোগান তাঁর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব না দিয়ে পিতামহ এই খাদ্য সঙ্কটকালে তাঁকে যে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ফেললেন, সে বিপদের ঝুঁকি নিতে তিনি রাজি নন। পিতামহ যদি বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করাতে না পারেন; তাহলে তিনি খাদ্য-দপ্তর থেকে পদত্যাগ করবেন।

বিষ্ণুর পদত্যাগের হুমকী শ্রুত বৃদ্ধ ব্রহ্মার করুন অসহায় অবস্থাটা মেনকার মানসপটে জীবন্ত ভেসে উঠল। না, যে-কোন উপায়ে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতেই হবে।

দেবরাজ শচীপতির নির্দেশে পার্লামেণ্টে উর্বশী-রম্ভা-তিলোত্তমাকে অধিক ভোটে পরাজিত করে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করাবার জন্য। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে সক্ষম না হলে স্বর্গে হবে না তাঁর স্থান; যদি বা হয়, তা হবে সংস্কৃত লুপ্ত 'হ'-এর মত।

তিনি বিশ্বামিত্রের আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন ঊর্ধ্ববাহু বিশ্বামিত্র যেন প্রাণহীন জড় পদার্থ। তাঁর মনে পড়লো বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে পিতামহ ব্রহ্মার একটা কথা—বিশ্বামিত্রের মত বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণধী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়চিত্ত মানুষ ইতিপূর্বে কখনো জন্মায়নি। তাই তাঁর মনে একটা ভয়, একটা সংশয় দেখা দিল।

দুর্গানাম স্মরণ করে তিনি আবার গান ধরলেন। তিনি জানেন এক্ষেত্রে সঙ্গীতই একমাত্র অস্ত্র।

সে-সঙ্গীতে সমস্ত অরণ্য থমথম; অরণ্যের পশুপক্ষী, তরুলতা মুগ্ধ; কুলায় প্রত্যাগত পক্ষীর কূজন, আহার সমাপনান্ত হর্ষোৎফুল্ল পশুর ঘোঁঘান হল বন্ধ; তরুলতার শাঁ শাঁ শব্দ সে-সঙ্গীতের কাছে হল পরাজিত।

কিন্তু তপস্বী বিশ্বামিত্র পূর্ববৎ স্থির, অচঞ্চল।

ক্লান্ত মেনকা হতাশায় বসে পড়লেন। ব্যর্থতায় বুক যেন তাঁর ভেঙে যায়। শুধু ভাবতে থাকেন আপন অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন বিশ্বামিত্র চক্ষু উন্মীলিত করছেন। পলকে হল তাঁর পরিবর্তন। তাঁর বিলোল-হিল্লোল কটাক্ষে ঝিলিক দিয়ে গেল বিদ্যুৎ, বাসনা-স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে ঝরে পড়ল কামনা।

বিশ্বামিত্র ঊর্ধ্ববাহু নত করলেন। মেনকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'অয়ি বরাঙ্গনে! কস্ত্বং, কে তুমি।'

মেনকার ওষ্ঠাধরে মেয়েলি হাসি—দ্ব্যর্থকবোধক। তিনি মাথা ঈষৎ নীচু করে বাঁকা চোখে বিশ্বামিত্রের দিকে চেয়ে বললেন, 'অয়ি নরপতি, আমি সামান্যা মানবী।'

কিন্তু বিশ্বামিত্র ভেবেছেন, এতো নিখুঁত সুন্দরী, এতো উজ্জ্বল রূপসী, এতো মোলায়েম লাবণ্যময়ী রমণী মানবী নয়, নিশ্চয় কোন দেবী, তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট সৃষ্টিকর্তা তাঁকে পরীক্ষা করতে এই দেবীকে পাঠিয়েছেন। তাই তিনি বললেন, 'অয়ি, তুমি মানবীও নও, দেবী; তুমি গ্রহণ করো আমার প্রণতি।'

মেনকা মুহূর্তের জন্য কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, বিশ্বামিত্র কী বুঝতে পারলেন তাঁর আসল পরিচয়; কিন্তু আপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন; তাই তিনি অতি সতর্কে ও সাবধানে উত্তর দিলেন, 'হে সম্রাট! আমি দেবী নহি, মানবী!'

বিশ্বামিত্র: সত্যই তুমি মানবী।

মেনকা: হ্যাঁ, সম্রাট।

বিশ্বামিত্র: কোন মানবীর তো এখানে আগমন সম্ভব নয়। দুর্গম, শ্বাপদসঙ্কুল, জনমানবহীন এই নির্জন অরণ্যে তুমি এলে কী করে?

মেনকা ভাবলেন, ছলনাই যখন তাঁর কর্তব্য, তখন মিথ্যা কথাই তাঁর বেসাতি। তিনি দুঃখের ভাণ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, সে-কথা জেনে কী হবে সম্রাট! বহুদিন ধরে বহু কষ্ট করে এখানে পৌঁচেছি।'

বহুদিন ধরে বহু কষ্ট করে তাঁর কাছে একটী নারীর আগমন শুনে বিশ্বামিত্রের মনের এক কোণে অঙ্কুরিত হল সহানুভূতি। তিনি নরম সুরে বললেন, 'কেন তুমি এখানে এসেছ...'

মেনকা: অধিপতি বিশ্বামিত্র, বলছি সে-কথা; কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কী...

বিশ্বামিত্র : অয়ি প্রষ্টে! কী তোমার প্রষ্টব্য…

মেনকা : হে জগতাধিপতি! মৃগয়া আর বর্ণিনী বরাঙ্গনার নৃত্য-গীত পরিত্যাগ করে তুমি কেন এই কঠোর তপস্যা করছো…

এই বাচালতায় বিশ্বামিত্র রুষ্ট হলেন, তিনি কণ্ঠস্বর কর্কশ করে বললেন, 'অয়ি ললনে! তোমার ধৃষ্টতা অসহনীয়।'

মেনকা বুঝতে পারলেন, এত দ্রুতগতিতে তাঁর অগ্রসর হওয়া উচিত হয় নি। তিনি বিনম্রবচনে বললেন, 'নরপতি বিশ্বামিত্র, মার্জনা করো আমার ধৃষ্টতা, আমার কৌতূহল—জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কেন করছে এই কঠোর তপশ্চর্যা।'

বিনয়বচনে সুন্দরী তরুণীর ক্ষমা চাওয়ায় বিশ্বামিত্রের মনে কোমলতা উপজিল। তিনি নরম সুরে বললেন, 'শোন সে-কথা। একদা আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনুটি চেয়েছিলাম…'

মেনকা : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটের লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামান্য ধেনু…

বিশ্বামিত্র : অয়ি তন্বঙ্গে, সামান্য নয় সে-ধেনু, অসামান্য! জগতের কিছুই অদেয় নেই তার কাছে। জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু অসামান্য তার স্থান রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদে। যাক সে কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ দিলেন না মোরে সে-ধেনু। জোর করে নিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু একক ব্রাহ্মণের কাছে আমার সব সৈন্য-সামন্ত শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই হতে চেয়েছিলাম ব্রাহ্মণ…

মেনকা : হে জগতাধিপতি ক্ষত্রিয় নৃপতি, তুমি হতে চাও ব্রাহ্মণ! এ মোহ থাকা তোমার উচিত নয়। মানুষের জাতি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়, মনুষ্যত্বই মানুষের পরিচয়ের মানদণ্ড। হে রাজকুলতিলক, তারপর কী হল…

বিশ্বামিত্র : সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দিলেন না মোরে ব্রাহ্মণত্ব। তাই

আমার প্রতিজ্ঞা—আমিও হব ব্রহ্মার মত স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তা জানুন, মানুষ কোনও অংশে তাঁর চেয়ে কম নয়। তাই আমার এ কঠোর তপস্যা।

মেনকা: হে রাজশ্রেষ্ঠ! তোমার কোমল অঙ্গে এত কষ্ট কী সহ্য হয়। এ গহন কাননে তপস্যা না করে রাজপ্রাসাদে করলেই তো পারতে…

বিশ্বামিত্র: অয়ি কোমলাঙ্গী! শ্রেষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে কঠোর তপশ্চর্যার প্রয়োজন। এইস্থলে দেবর্ষি নারদ কঠোর তপস্যা করে সর্বজ্ঞ হয়েছেন। জানো, ইতিপূর্বে কোন মানব এখানে বসে তপস্যা করেনি…

মেনকা: হে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! কী সৃষ্টি করা তোমার বাসনা…

বিশ্বামিত্র: হে সামান্যা নারী! তা শুনে তোমার কী প্রয়োজন।

মেনকা: আমার প্রয়োজন নেই কিছু; কিন্তু তোমারই বা কী লাভ…

বিশ্বামিত্র: স্রষ্টার লাভ আনন্দ। তুমি নারী, লাভ-ক্ষতির হিসেব করা তোমার ধর্ম; পুরুষের ধর্ম সৃষ্টি করা…

'আর সন্ন্যাসীর ধর্ম নারী-বিদ্বেষ, কেমন,' যেন বিশ্বামিত্রের মুখের কথা কেড়ে নেয় মেনকা। 'বলো না, কী সৃষ্টি তোমার বাসনা।' তাঁর ওষ্ঠাধরে মিহি হাসি—দ্ব্যর্থকবোধক।

বিশ্বামিত্র তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে আরো গাম্ভীর্য সংযোগ করে বললেন, 'নূতন পৃথিবী…'

খিলখিল করে হেসে উঠলেন মেনকা। তিনি এমনভাব দেখালেন বিশ্বামিত্র যেন তাঁর সঙ্গে তামাসা করছেন। হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা পৃথিবী সৃষ্টি করেই বা কী করবে?'

তন্বী যুবতীর এই চপলতায় বিশ্বামিত্রের উত্তুঙ্গ আত্মসম্মানে যেন ঘা লাগলো। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'অয়ি অবলা বালা! এ তুমি বুঝবে না।'

ঝটিতি মেনকা উত্তর দেন, 'মানি আমি অবলা, জানি তুমি জিনিয়াস্। কিন্তু একটা পৃথিবী সৃষ্টি করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কী উপকার করবে···কিছুই না। এই পৃথিবী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাশূন্যে মহাসাগরের বালুকাতীরের একটা তুচ্ছ বালুকণার সামান্য অংশ মাত্র। এই রকম একটা পৃথিবী সৃষ্টি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব শূন্যতা যে কিছু কমাবে-- তাও নয়···।' কী যেন ভেবে নিয়ে মেনকা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমার বিশ্বাস—তোমার এই কঠোর কৃচ্ছসাধন তুচ্ছ একটা পৃথিবী সৃষ্টির জন্য নয়··· ।'

এই অশ্রুতপূর্ব কথা শ্রবণে বিশ্বামিত্র একটু হতবুদ্ধ হলেন। তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন, 'আমার কৃচ্ছসাধন কীসের জন্য তোমার মনে হয়···'

বাইরে সহজভাব দেখিয়েই মেনকা বললেন, 'রমণীর প্রেম···'

সংযমের তুঙ্গশীর্ষে অধিষ্ঠিত বিশ্বামিত্র ঘৃণা করেন ষড়রিপুর অধীন সাধারণ মানুষকে। তাই তিনি ঘৃণামিশ্রিত করুণার হাসি হেসে বললেন, 'হে প্রগলভা তরুণী! তুমি যে সেই চিরন্তন নারী; তাই তোমার কাছে আমার তপস্যার উদ্দেশ্য রমণীর প্রেম।'

মেনকা: হে রাজন! শুধু আমার কাছে নয়, তোমার কাছেও। তোমার চেতন মনের বাসনা হয়তো নূতন পৃথিবী রচন; কিন্তু তোমার অবচেতন মনের কামনা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীর প্রেম; নইলে দূরদূরান্ত থেকে আমিই বা আসব কেন এই জনমানবহীন দুর্গম অরণ্য-প্রদেশে। তুমি সাধনা করছ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীর···'

বিশ্বামিত্র: হে কামনা জর্জরিতা রমণী! তোমার নামই যে কামিনী—কামনাই তোমার মুখ্য উপজীব্য; পুরুষের পৌরুষ সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই।

মেনকা : পুরুষের পৌরুষ…হাসালে সম্রাট! সারা জীবনটা শুধু অরণ্যে তপস্যা করে কাটালে—এটা পৌরুষ নয়, পলায়নী-বৃত্তি।

মেনকার বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাক্যে বিশ্বামিত্র ভিতরে ভিতরে অসহায় বোধ করলেন; কিন্তু অন্তরের এই অসহায়ভাব বাইরে প্রকাশ পেতে তিনি দিলেন না। অথচ সম্মুখ থেকে একে সরাতে পারলে যেন স্বস্তি পান। তাই বললেন, 'হে প্রমত্তা রমণী! বন্ধ কর তোমার প্রলাপ; আমি তপস্বী, বাধা সৃষ্টি করো না আমার তপস্যায়, তুমি ফিরে যাও তোমার আপন গৃহে।'

মেনকা অসহায়ের ভান করে বললেন, 'কোথায় ফিরে যাবো, ফেরবার যে পথ নাই…'

'ফেরবার পথ নাই…'

কথাটির মধ্যে নরম সুরের একটু আভাব থাকায় মেনকা ধরে ফেললেন বিশ্বামিত্রের মনের অবস্থাটি। তিনি নিমেষে নিজেকে বদলিয়ে ফেললেন। চোখ ছলছলিয়ে তিনি আবেগে বলে যেতে লাগলেন, 'না, রাজন! কত নদ, কত নদী, কত গিরি, কত প্রান্ত বহু কষ্টে অতিক্রম করেছি—শুধু তোমারই জন্য; কতদিন, কত রাত্রি অনাহারে কাটিয়েছি—শুধু তোমারই জন্য; শ্বাপদসঙ্কুল এই অরণ্যে বহু বিপন্নে পড়েছি—শুধু তোমারই জন্য। প্রতি নিশীথে স্বপ্নে যে মুখ দেখে চকিতে জেগে উঠেছি—সে যে তোমারই মুখ। আজ আমি আমার স্বপ্ন ও সাধনার ধন পেয়েছি। ফিরে যেতে মোরে বলো না রাজন।'

বিশ্বামিত্র বিস্মিত। তবু স্বপক্ষে বললেন, 'পৃথিবীতে বহু রাজা, বহু মনীষী, বহু যোদ্ধা রয়েছেন—তুমি তাঁদের কাউকে বরণ কর।'

'তাহলে আমি দ্বিচারিণী হব, রাজা। যৌবনের আরম্ভেই তোমাকে মনে মনে বরণ করেছি। তোমাকেই আমি মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি,

তোমারই উদ্দেশ্যে আমি আমার দেহ উৎসর্গ করেছি ; ভ্রষ্টা হতে মোরে বলো না।' একটু থেমে তিনি বিশ্বামিত্রের পায়ে হাত রেখে বললেন, 'এখানে আমাকে একটু স্থান দাও রাজা।'

বহু বৎসর মানুষের স্পর্শলেশহীন বিশ্বামিত্র মেনকার হস্তস্পর্শে ভীষণ শিহরিয়ে উঠলেন। তাঁর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হল রোমাঞ্চিত। ধমনীর রক্তসঞ্চালন হল দ্রুত, দেহের উষ্ণতা হল বৃদ্ধি।

মানুষের, বিশেষতঃ রূপবতী তরুণীর দেহস্পর্শে তাঁর অনুভূতির তারে ঝঙ্কারিত হল প্রাণের সুর ; তিনি অনুভব করতে থাকেন এক অনির্বচনীয় পুলক।

তিনি বিশ্রব্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন আনতলোচনা মেনকার মুখের দিকে। সায়াহ্ন সূর্যের রক্তিমদ্যুতি প্রতিফলিত মেনকার আরক্তিম কপোল বেয়ে পড়ছে অশ্রু।

বিশ্বামিত্র হতভম্ব, তিনি নির্বাক।

শুধু শূন্য নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করতে লাগল ক্রন্দিতা মেনকার ব্যথাভরা দীর্ঘ-শ্বাস।

কিছুক্ষণ কাটল।

বিশ্বামিত্র মেনকার চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটিকে নিজের মুখের দিকে তুলে ধরলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তোমরা বিনে কারণে যেমন হাস, তেমনি বিনে কারণে কাঁদ। কিন্তু মেনকার অশ্রুপ্লাবিত আকুল মুখটি দেখে শুধু বললেন, 'কেঁদোনা।'

বিশ্বামিত্রের মমতা-মাখানো এই কথাটির মধ্যে তাঁর হৃদয়ের সুরটি বেজে ওঠায় মেনকার ক্রন্দনের ফোঁস-ফোসানি সাময়িক বেড়ে গেল ; কিন্তু ক্রমে কমে এলো তার দীর্ঘ-সূত্রতা।

মেনকার কান্না থেমে গেলে চিন্তাক্লান্ত বিশ্বামিত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন্ কুলোদ্ভবা ?'

মেনকা চোখের জল মুছে বললেন, 'আমি শ্রেষ্ঠবর্ণজ।'

বিশ্বামিত্র : তবে আমাকে কেন বরণ করলে?

মেনকা : হে রাজন! জাত্যাভিমান আমার নাই, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে পুরুষোত্তমের কণ্ঠে বরমাল্য দেওয়াই আমার আজন্মের কামনা।

বিশ্বামিত্র : তুমি জাতিধর্ম মানো না; তবে তুমি কী বাঙ্গালিনী?

মেনকা : এ নহে মোর পরিচয়, মোর পরিচয় মোর অঙ্গে, হে রাজন! তুমি কী শোননি পশ্চিমী নারী পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকেন···

বিশ্বামিত্র : শাস্ত্রে তাদেরকে ম্লেচ্ছ কহে।

মেনকা : শাস্ত্র-বাক্য জেনে আমার লাভ নেই। নারীর মুখ্য কামনা পুরুষোত্তমের জীবন-সঙ্গিনী হওয়া।

বিশ্বামিত্র : তুমি শুধু সুগায়িকা নও, বেশ বোঝা যাচ্ছে তুমি অতীব বিদুষীও, তুমি কতদুর অধ্যয়ন করেছ···

মেনকা স্রেফ বলে ফেললেন, 'আমি আর্যাবর্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ; তারপর মাথা নীচু করে বললেন, 'কিন্তু রাজন, সে নহে মোর পরিচয়, আমার পরিচয় আমার প্রেম···' বলে মেনকা বিশ্বামিত্রের ডান হাতটা নিজের হাত দুটোর মধ্যে টেনে নিয়ে আলতভাবে নিপীড়ন করতে লাগলেন।

আর বিশ্বামিত্রের দেহাভ্যন্তরে আদিম মানবের সুপ্ত আদিম প্রবৃত্তিটা ধীরে ধীরে জেগে উঠল! তাঁর হৃদয় হল উর্মিমুখর, মন হল উচাটন। তিনি মেনকার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি সত্যই আমার জন্ম এখানে এসেছ···'

মেনকা বুঝতে পারলেন বিশ্বমিত্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন;

কিন্তু এখনও মানসিক দ্বন্দ্বের সংঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বিশ্বমিত্রের এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে তিনি তাঁর মোক্ষম অস্ত্র হানলেন, 'আবার এ প্রশ্ন কেন, রাজা! আমি যেমন তোমাকে একান্ত চেয়েছি, তুমিও তেমনি আমাকে একান্ত চেয়েছো, তাই আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ-মিলন সম্ভবপর হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, যখন বিশেষ কোন নর-নারী পরস্পর পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে; তখন তারা সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে মিলিত হয়।'

বিশ্বামিত্র তবুও স্থির-চিত্ত হতে পারলেন না, 'আমার নূতন পৃথিবী সৃষ্টির সাধনা তাহলে…'

মেনকা বিশ্বামিত্রের কথাটা শেষ করতে দিলেন না, 'য্যা! তুচ্ছ একটা পৃথিবী সৃষ্টির জন্য সহস্র বৎসরের সাধনা তোমার নয়, তোমার সাধনা অন্তর্যামী প্রেমের—সেও সহস্র বৎসরের সাধনার বস্তু। তুমি কী জাননি রমণীর প্রেমের জন্য কত নর করেছে তপস্যা, কত সম্রাট পরিত্যাগ করেছে সিংহাসন…'

'জানি'

'তবে তোমার কী বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার এ তপস্যা আমার প্রেমের জন্য…'

'না—না—না—, তা নয়…' বিশ্বামিত্র আর কিছুই বলতে পারলেন না, অন্তরের উত্তাল তরঙ্গে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ।

সদ্য নিদ্রোত্থিত ক্ষুধিত সিংহ সম্মুখের উত্তম আহার্য প্রাণীর দিকে তার বলিষ্ঠ থাবা আপনা হতে প্রসারিত করে দেয়—তারপর ধৃত সেই পশুকে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে পিষ্ট করে; তেমনি বিশ্বামিত্রের বহু দিবসের উপবাসী দেহ সম্মুখের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বিদুষী তরুণীর কটিদেশ বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ করল।

তাঁর মুখ মেনকার মুখের দিকে নত হল। তাঁর কামনা-ক্ষুধিত ওষ্ঠাধর মেনকার মধুবর্ষী ওষ্ঠাধরের সন্নিকট হল।

মেনকা এতো শীঘ্র নিজেকে বিশ্বামিত্রের কাম-তৃষ্ণার কাছে সম্পূর্ণ করতে চাইলেন না; তিনি বিশ্বামিত্রের তৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে তুলতে চাইলেন। তাই তিনি বললেন, 'হে মোর দয়িত! এখন থাক, আগে কুঞ্জবনে যাই। সেথা মোরা প্রেমের অভিনব স্বর্গলোক রচনা করবো।'

'কোন কুঞ্জবনে…'

'কণ্বমুনির তপোবন-সংলগ্ন কুঞ্জবন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রম্য কুঞ্জবন।'

'সূর্যদেব অস্তমিত। এই গোধুলি-লগনে যাত্রারম্ভ শুভ। ওঠ, দয়িতে…' বলে বিশ্বামিত্র মেনকাকে নিয়ে ত্বরিতে উঠে দাঁড়ালেন।

আর বিজয়িনী মেনকার মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হল ভুবন-বিজয়ী দীপ্তি; তাঁর মধুক্ষরা ওষ্ঠাধারে ঝরে পড়ল ছলনার গরল-হাসি।

জিজীবিষা

—মড়-মড়-মড়-মড়াৎ—ভীষণ শব্দে উঠানের আমগাছটার মূল ডালটাও অবশেষে ভেঙ্গে পড়ে গেল।

বাপের জানু দুটোর মধ্যে উপবিষ্ট কাতু ভয়ে আর একবার শিউরে ওঠল। সাহস দেবার জন্যে পরাণ পুত্রকে আরো কোলের কাছে টেনে নিল। কিন্তু নিজেও এই প্রথমবার কেঁপে ওঠল।

হলদী নদীর মাঝি পরাণ। বার বছর বয়েস থেকে এই ছত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত যে পৌনে একমাইল চওড়া নদীতে ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত খেয়া দিয়ে এসেছে—সেই পরাণ মাঝি, সেও ঘরের মধ্যে বসে কেঁপে ওঠল।

পরাণ পাটুনি—দীর্ঘ সাত ফুট লম্বা, মাথায় কোঁকড়ান লম্বা লম্বা চুল, উঁচু কপাল, খাঁদা নাক—নাকের অগ্রভাগ মধ্যোন্নত, গোল ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট, উঁচু গালের হাড়, প্রশস্ত বক্ষ, বাঁশের কঁড়ার মতো মোটা মোটা দীর্ঘ হাত-পা, আবলুষের মতো গায়ের রং ভীষণ কালো—অর্থাৎ সব মিলে ভয়ানক কুৎসিৎ কদাকার চেহারা, যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন অরণ্য-মানব। নৃতত্ত্ববিদ তার দেহের মধ্যে নিগ্রো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্যরক্তের সন্ধান করতে গিয়ে হয়তো শুধু পাবেন নিগ্রোবটু ও প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েডীয় রক্ত; কিন্তু পাবেন না তার মধ্যে নিগ্রোবটু বা প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েডীয় হিংস্রতা বা বর্বরতা। এই দীর্ঘকায় কুৎসিৎ লোকটির মধ্যে শুধু দেখতে পাবেন সামুদ্রিক দুঃসাহসিকতা আর একটি অত্যন্ত কোমল নরম হৃদয়—হলদী নদীর

অববাহিকার মতো, বাঙ্লার পলিমাটীর মতো, একান্ত কোমল, একান্ত নরম একটী হৃদয়।

পরাণের সংসারে তারা দুজন—পরাণ আর তার ছেলে কাতু। কাতুর মা কাতুর ষষ্ঠীর দিনে তার নাম রেখেছিল কার্তিক—তার রূপে নয়। কাতু রূপে তার মা-বাপের মতো ঘন নিকষ কালো। কানা ছেলের নাম স্নেহান্ধ জননী যেমন রাখে পদ্মলোচন, কাতুর মা তার কালো সন্তানের নাম তেমনি রেখেছিল কার্তিক। তারপর কার্তিক কখন কী ভাবে যে 'কাতু' হয়ে গেল ভাষাতত্ত্বের এই বিবর্তন জানতে হলে সুনীতি চাটুর্যের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বছর চারেক আগে শীতের শেষে এই অঞ্চলে কলেরার যে ভীষণ মড়ক হয়, তাতে কাতুর মাও মারা যায়।

খেয়া দিতে দিতে পরাণ শুনতে পেল তার বউয়ের কলেরা হয়েছে। খেয়াঘাট থেকে তার বাড়ী প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে। পরাণ ছুটে গেল বাড়ীতে। সত্যিই! তখুনি সে ছুটল দীনবন্ধু ডাক্তারের ডিস্পেনসারীতে মাইল দেড়েক দূরে—একটা মাঠ ও একটা খাল পেরিয়ে যেতে হয়। ডিস্পেনসারীতে লোকে লোকারণ্য—যেন রথযাত্রার মেলা। ডাঃ দীনবন্ধু একটা হোমিওপ্যাথিক শিশি থেকে প্রত্যেকের জলভরা বোতলে দু'ফোঁটা ওষুধ দিচ্ছে আর এক টাকা করে দাম ও 'বিজুট' নিচ্ছে। পরাণ একটা টাকা দিয়ে ওষুধ নিয়ে আবার ছুটল বাড়ীর দিকে।

বউকে একদাগ ওষুধ খাইয়ে দিয়ে কাতুকে তার কাছে বসিয়ে রেখে সে ছুটল খেয়াঘাটে। দেরী করবার তার উপায় নেই। পারাপার হওয়ার জন্য কত লোকই না বসে আছে খেয়াঘাটে। রহিম, জাফর, সাদাৎ, কেরামৎ—কাউকে সে পেলনা নৌকাটা একটুক্ষণ চালাবার; তাদের কেউ বা কলেরায় আক্রান্ত, কেউ বা বাড়ীর অন্য কারোর অসুখে ব্যস্ত।

বহুলোককে পারাপার করিয়ে দিয়ে খেয়াঘাট থেকে পরাণ যখন ফিরল, তখন তার বউ পরপারে যাবার খেয়াঘাটে পৌঁচেছে। পরাণের প্রাণটা হু হু করে ওঠল। মাত্র আঠার বছর বয়সে তার এমন স্বাস্থ্যবতী বউটা এমনভাবে মরে যাবে—সে কোনদিন তা ভাবেনি। কাতুর পাশে বসে সে শুধু তার মুমূর্ষু বউয়ের দিকে জলভরা চোখে চেয়ে রইল। তার বউ তার এই শেষসময়ে কঁকিয়ে কঁকিয়ে তাকে বললো, 'কাতুর বাপ গো, কাতুর বাপ, মুই ত গ্যালাম, মোর কাতুকে তোকে দিয়া যাইঠি, অকে মারবি-ধরবি না...'

মাতৃহীন সন্তানকে পরাণ একদিনের তরেও মারধর করেনি। কাতুর জন্য সে বিয়েও করেনি। পাছে তার ভাবী বউ তাকে তাচ্ছিল্য করে, মার-ধোর করে। পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু সে নিঃশেষে দিয়ে দিয়েছে কাতুকে।

পরাণের দরদীরা তাকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল। এই সব দরদীরা তার প্রতিবেশী; কিন্তু তারা মুসলমান। তাই তারা পারল না পরাণের বিয়ের চেষ্টা চরিত্র করতে কিংবা তাদের জাতের মেয়েকে পরাণের সঙ্গে বিয়ে দিতে।

মুসলমান-প্রধান এই পাড়াটায় পরাণ পাটনিরাই একমাত্র হিন্দু। পুরুষানুক্রমে তারা এখানে বাস করছে। মাঠের সেই সেপারে হিন্দুপাড়া। তাছাড়া চৌদ্দ-পনের ক্রোশের মধ্যে পরাণের জাতের আর কোন হিন্দু নেই। চৌদ্দ-পনের ক্রোশ উত্তরের খড়দহ গ্রামে তার জাতের কয়েক ঘর বাস করে। সেখান থেকে সে কাতুর মাকে বউ করে এনেছিল। সে প্রায় বছর দশেক আগের কথা। তারপর সেদিকে পরাণের আর যাওয়া ঘটে উঠেনি।

দরদী প্রতিবেশীরা যখন তাকে বলতো, 'পরাণ সাদি কর, পরাণ চাচা সাদি কর...'

সে তখন বলতো, 'কুলে বাতি দিবার জন্ম ত সাদি করা। সে ত হয়্যা গ্যাছে। কাতু আর একটু বড় হউ, ওরই বিয়া দিয়া দিব।'

পরাণ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে কাতুর বার বছর বয়স হলেই তার বিয়ে দিয়ে দিবে।

এখন কাতুর বয়েস আট।

সেই আট বছরের কাতুকে কোলে নিয়ে কেঁটুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের এককোণে বসে আছে পরাণ আর স্মরণ করছে ভগবানের নাম।

আজ সকাল থেকে বাতাসটা বেগে বইতে সুরু করে; কিন্তু সুরু হয়েছে কাল রাত্রি থেকেই। কখনও বা গুঁড়ি গুঁড়ি, কখনও বা ঝম্‌কা ঝম্‌কা। আশ্বিন-কার্তিকে প্রায় প্রতি বছরই মাঝে মাঝে এরকম ঝড়-বৃষ্টি হয়ে থাকে; কিন্তু আজকের এই ঝড়-বৃষ্টি ভিন্ন প্রকৃতির।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টি ও বাতাসের গতি প্রায় একরকম ছিল; কিন্তু দুপুরের পর উভয়ের গতি দ্রুতবেগে বেড়ে উঠল এবং সন্ধ্যার দিকে হয়ে উঠল ভয়ংকর। গাছের ডাল ভাঙ্গা, চালের খড় উড়া সুরু হল।

সোঁ সোঁ শব্দে এক একটা দমকা আসছে গাছের ডালগুলো অমনি মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ছে, চালের খড়গুলো ঝট্‌ ঝট্‌ ছিঁড়ে উড়ে পড়ছে। ক্রমে ক্রমে পরাণের ঘরের চালের খড় প্রায় উড়ে গেল এবং উত্তর দিকের চালের একাংশ কাঠামো সমেত পড়ে গেল।

বৃষ্টির জলে ঘরের জিনিষপত্র ভিজে যেতে লাগলো।

ঘরের পশ্চিম পাশে খুঁটির উপর একটা চওড়া তক্তা। তার উপর কাঠের ও টিনের গোটা দুই বাক্স, চাল-ডাল ইত্যাদির দু'চারটে হাঁড়ি-

ভাঁড়। কক্ষটির কুলুঙ্গিগুলিতে, এদিকে-ওদিকে শিশি-বোতল, থালা-বাসন, ঘরকন্নার হেনতেন নানা টুকিটাকি জিনিষপত্র। সমস্তই ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরাণের সেদিকে ততো লক্ষ্য নেই; সে ভাবছে তার নিজের কথা, কাতুর কথা আর তার নৌকার কথা।

আজ সকাল থেকেই খেয়া বন্ধ। বাতাসের মত্ততায় নদী উন্মত্ত। তাতে নৌকা-চালানো মাঝি ও আরোহী উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক। আকাশের ও বাতাসের অবস্থা দেখে পরাণ সকালেই অনুমান করতে পেরেছিল প্রকৃতির ভাবী ভয়ংকর রূপটা। তাই শক্ত কাছি দিয়ে নৌকাটাকে বটগাছের সঙ্গে ভালো করে বেঁধে রেখেছিল এবং মোটা চেন দিয়েও নোঙর করে রেখেছিল।

মাঝে মাঝে সে নৌকাটাকে গিয়ে দেখে আসছিল; কিন্তু বিকেল থেকে আর ঘর থেকে বেরোতে পারল না। এখন যে নৌকাটির অবস্থা কী—কে জানে? কাছি ছিঁড়ে ভেসে যেতে পারে, কিংবা আছাড়ে তলাটা ফেসে যেতে পারে। সে রকম যদি কিছু হয়—সে আর ভাবতে পারে না; নৌকাটা যেন তার দ্বিতীয় কাতু, তা যে তাদের বন্ধু, তাদের জীবনদাতা।

খেজুর পাতার তালাই, ময়লা অপরিচ্ছন্ন শতছিন্ন দু'টি কাঁথা, তেমনি চটের দুটী বালিশ এবং পরণের দু'একটা কাপড়-চোপড়—এগুলিকে নিয়ে পিতাপুত্রে কক্ষটির বায়ুকোণে আশ্রয় নিয়েছে। চালের এদিকটায় এখনও খড় আছে। পরাণ তালাইটার উপর একটা কাঁথা পেতে অপরটা পিতাপুত্রে গায়ে জড়িয়ে বসে রয়েছে। চালের ফাঁক দিয়ে ছিট কেটে বৃষ্টির ঝাপটা মাঝে মাঝে তাদের উপর এসে পড়েছে। বৃষ্টির জল ক্রমে ক্রমে ঘরে জমে উঠল এবং ক্রমশঃ তা গড়িয়ে এসে তালাইয়ের তলায় ঠেকল।

বৃষ্টির জলে ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসে শীতে তারা ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

ঝড়টা ক্রমে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরল এবং তার বেগও আরো শতগুণে বেড়ে গেল—যেন 'ঊনপঞ্চাশ পবন' তাদের সমস্ত শক্তি আজকে এইখানে নিয়োগ করেছে।

সন্ধ্যার সময় পরাণের রান্নাঘরটা পড়ে গেছে, এবারে ঘরের পশ্চিম পাশের দেওয়াল পড়তে সুরু করল।

পরাণ জীবনে অনেক ঝড় দেখেছে; কিন্তু এমন ঝড় জীবনে কখনও দেখেনি। সে তার ঠাকুরদার মুখে শুনেছে 'বাহাত্তরের ঝড়ে'র কথা। বাংলা ১২৭২ সালের বৈশাখ মাসে যে কাল-বৈশাখীর ঝড় হয়েছিল, তা নাকি ঘণ্টা তিনেক স্থায়ী হয়েছিল, তাতে নাকি অনেক গাছপালা পড়েছিল, কিছু কিছু ঘরও পড়েছিল। কিন্তু এই যে ঝড়—এর যে তুলনা নেই। চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে তবুও এ থামল না। সে ভাবল গাছপালা সব পড়ে গেছে নিশ্চয়ই, বহু বাড়ী ঘরও। সে আরো ভাবল এইবার দেওয়াল চাপা পড়ে তারা মারা যাবে। কিন্তু বাঁচবারো তো কোন উপায় নেই। বাইরে যাবে কোথায়? এখানে এমন কোন বাড়ী নেই যা এই ঝড়ে টিকতে পারবে। সবারই অবস্থা হয়তো এখন তারই মত। সন্ধ্যার সময় সে কয়েকবার 'আল্লা-হো-আকবর' শুনতে পেয়েছিল।

দেওয়ালের বেশ খানিকটা অংশ ঝপাৎ করে পড়ে গেল। কাতু ভয়ে বলে উঠল, 'কাঁথ পড়্যা যায়ঠে, মন্নে যে চাপা পড়্যা মর্যা যাব।'

পুত্রের মুখে হঠাৎ মরণের কথা শুনে পরাণ চমকে উঠল। তারপর পুত্রের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ভয় কি কাতু, এবার ঝড়-বৃষ্টি থ্যামা যাবে'—পুত্রকে আশ্বাস দেয় বটে; কিন্তু পরাণ নিজে আশ্বস্ত হতে পারে না। ভয়ে তারও অন্তরাত্মা কাঁপছে।

এই সেই পরাণ যে মাসখানেক আগে থানা আক্রমণকারী দলের ছিল পুরোধা।

কংগ্রেসের নেতা অজয় সামন্ত বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী ইংরেজকে ভারত ছাড়ার শেষ নোটিশ দেওয়ায় বড়লাট গান্ধীজী, পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের সবাইকে জেলে দিয়েছেন। ভারত থেকে ইংরেজ তাড়াবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী যেন এই আন্দোলনে যোগদান করেন—গান্ধীজীর এই আবেদন অজয়বাবু তাদের জানিয়েছিলেন। অজয়বাবু সেই সভাতে তাদের বুঝিয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়াতে হলে আগে আমাদের দখল করতে হবে থানা, তারপর আদালত কোর্ট ইত্যাদি; এমনি করে তমলুক, মেদিনীপুর, কলিকাতা, অবশেষে দিল্লী আমাদের অধিকার করতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়িত হলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন, স্বাধীন ভারতবর্ষ! সেদিন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে রামরাজত্ব! সেদিন থাকবে না ভাতের অভাব, থাকবে না কাপড়ের অনটন···

তখন তার অনুভূতিতে যে উদ্দীপনা জেগেছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

নন্দীগ্রাম থানা দখল করার জন্য যে তিনটি দল তিন দিক থেকে আসছিল, তার একটি দলের সে ছিল পুরোধা। তার পিছনে ছিল হাজার লোক; কিন্তু সে ছিল সবার চাইতে লম্বা, সবার চাইতে বলিষ্ঠ। সবাই যেন তার পশ্চাতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। পরণে তার ছিল খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের হাফ-সার্ট, মাথায় গান্ধী টুপি—অজয়বাবু এগুলি তাকে দিয়েছিলেন। এ পোষাক না হলে দলের অগ্রণী হওয়া যায় না।

হাল্-দাঁড় ধরা পাকা হাতে সে শক্ত করে ধরেছিল একটি লম্বা বাঁশ, সেটার মাথায় ছিল ত্রিবর্ণলাঞ্ছিত একটি বড় পতাকা। সুশৃঙ্খলভাবে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল।

যেতে যেতে সে ঘন ঘন কম্বুকণ্ঠে হেঁকে উঠতো—বন্দেমাতরম্—

সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হত—বন্দেমাতরম্—

সে মন্ত্র আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে থানার দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা দিত।

ক্রমে ক্রমে তিনটি দল এসে মিশল থানার সামনে। এই তিন দলেরই সামনে ছিল সে। সে নিজের মধ্যে এমন একটা অসাধারণ শক্তি আবিষ্কার করল যা সে এতদিন দেখতে পায়নি। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সেও যে ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে চলেছে, সেও ইংরেজ তাড়াতে চলেছে, সেও পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে স্বাধীন করতে চলেছে। সে তার পরবর্তী লোকটিকে বলেছিল তাকে যদি পুলিশ গুলি করে মারে সে যেন তার হাত থেকে পতাকাটি নিয়ে নেয়—মাটীতে পড়তে যেন না দেয়। তারপর বজ্রকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ বলে এগোতে সুরু করল। ভারতবর্ষের এই গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনে সে হবে প্রথম শহীদ, নয়তো সে হবে থানাদখলকারী প্রথম ব্যক্তি।

না, সে প্রথম শহীদ হয়নি, হয়েছিল থানা দখলকারী প্রথম ব্যক্তি।

হাজার হাজার লোক দেখে থানা-পুলিশ ভয় খেয়ে গিয়েছিল। গুলি করে কটা লোককেই বা মারতে পারে—দশটা, বিশটা, পঞ্চাশটা ··· তারপর ··· তারপর উন্মত্ত জনতা তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে; তার চেয়ে বরং চুপ মেরে থাকাই ভালো। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ভাগ্যে তাদের যা ছিল তা বলার নয়। পরাণ থানায় ঢুকে বড়ো দারোগার হাত দুটো ধরল। তারপর অজয়বাবুর নির্দেশমত আদেশ দিল তার অন্যান্য সঙ্গীদের—বাঁধ শালাদের—

পরাণের এই সময় মনে পড়েছিল সাদাৎ-জাফরদের। তারা কেউ দেখতে পেল না তাদের পরাণ চাচার এই বীরত্ব, এই সৌভাগ্য।

তাদেরকে সে ডেকেছিল। তারা এলো না। মৌলভী সাহেব তাদের নিষেধ করেছেন—জিন্না সাহেবের নাকি নির্দেশ কংগ্রেস আন্দোলনে মুসলমানরা যেন যোগ না দেয়।

থানার সবাই বাঁধা পড়লো। বড়ো দারোগা, ছোট দারোগা, জমাদার, সেপাই—সবাই। তারপর তারা চালান গেল কোথায়—পরাণ তা জানে না। সে শুনেছে হলদী নদীর লাল জলে তাদের রক্ত মিশে গেছে। তারপর একে একে মহিষাদল, সুতাহাটা থানা অজয়বাবুর দল অধিকার করে নিয়েছে। অজয়বাবু এখন এই তিন থানার উপর বড়ো কর্তা—'ম্যাজিষ্‌ট্রর।' 'ম্যাজিষ্‌ট্রর' অজয়বাবুকে কত গভীর অন্ধকার নিশীথে পারাপার করিয়ে দিতে হয় তাকে। তিনি তাকে কত খাতির করেন, কত ভালবাসেন।

এই সেই পরাণ।

এক ঝাপটা বৃষ্টি তাদের মাথার উপর এসে পড়লো। মাথা বাঁচাবার জন্য পরাণ কাঁথাটা মাথার উপর টেনে নিজে নিল আর একটা দিক পুত্রের মাথার উপর টেনে দিল। কিন্তু কতক্ষণ আর এমন করে দানবের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায়! পাতা কাঁথাটি যেমন ফুলে উঠেছে, পিঠের কাঁথাটিও তেমনি ভিজে হিম-পাষাণ হয়ে উঠেছে। বাপ-বেটা দুজনেই শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। পরাণ কাতুকে আরো কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগলো, পিঠে তার নূতন জামাটাও ভিজে জবজবে।

পরশুদিন সে এই জামাটা কাতুকে কিনে দিয়েছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জানাশোনা লোকের কাছ থেকে দু'চার আনা পয়সা সে পায়। তাই থেকে সে প্রতি বছর কাতুকে একটা ভাল সার্টিনের জামা কিনে দেয়। সেই নূতন জামাটা পরে কাতু রামপুরের জমিদার শাসমল বাবুদের বাড়ীতে পূজা দেখতে যায়। আজ মহাষ্টমী। কাল থেকে

কাতু আনন্দে আত্মহারা। সে আজ এই নূতন জামাটা পরে 'ঠাকুর' দেখতে যাবে, তারপর 'প্রসাদ' নিয়ে বাড়ী ফিরবে।

তাছাড়া আজ 'নলসংক্রান্তি'। কাতু মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল এই জামাটা পরে সে পিঠা চাইতে যাবে। প্রতি বছর নল-সংক্রান্তি ও পৌষ-সংক্রান্তিতে হিন্দু গৃহস্থ বাড়ীতে বাড়ীতে সে পিঠা চাইতে যায়।

কিন্তু এবার তার কিছুই হল না। এসব ভাবনা কখন তার মগজ থেকে পালিয়েছে। শুধু বাঁচবার ভাবনাই এখন তার একমাত্র ভাবনা।

পিঠে বাপের হাত-বুলোনয় সে বাপের মুখের দিকে মুখ তুলে চাইল। হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোতে সে দেখতে পেল বাপের শঙ্কাকুল মুখ। সে ভীতকণ্ঠে ডাকল—বাবু—

—কী—

—ঝড় কী থাম্‌বে নি—

—থ্যাম্যা যাবে, ভগ্‌বানের নাম কর—বলে নিজে ভগবানের নাম করতে লাগল।

কাতুও তার সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টভাবে বলতে লাগল—ভগ্‌বান রক্ষা কর, ভগ্‌বান রক্ষা কর—

এই সময় তারা একটা ভীষণ শব্দ শুনতে পেল—শুধু সোঁ-সোঁ-সোঁ শব্দ—দীর্ঘ একটানা। পরাণের মনে হল ঝড়ের বেগ বুঝি আবার বেড়ে গেল; কিন্তু ঝড়ের গর্জন তো এরূপ একটানা নয়। তার মনে হল গর্জনটা যেন জোয়ারের শব্দের মতো; কিন্তু তা তো এমন ভীষণ ভয়ংকর গর্জনশীল নয়। নৌকার মাঝি সে—সে ত একরকম জলের প্রাণী। নদীর জল দেখে সে বলে দেয় কখন কোন মুহূর্তে জোয়ার আসবে আর তার বেগ কেমন হবে। জোয়ার-ভাঁটা নিয়েই যে তার জীবন। প্রতি ঋতুর, প্রতি মাসের

প্রতিটি জোয়ার-ভাঁটার কাল, গতি সমস্তই তার নখদর্পণে। চৈত্র-কটালের জোয়ারই বছরের সব চাইতে বড়ো জোয়ার। কিন্তু তার গর্জন তো এ গর্জনের কাছে অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য, তবে এ কী? এ গর্জন যেন পাতালপুরের রাজ কন্যের সাতশ' রাক্ষসীর মৃত্যু-গর্জন!

পরাণের ইচ্ছা হল বেরিয়ে গিয়ে একবার দেখে আসে। কিন্তু সাহস পেল না, ঘরের বের হওয়া প্রাণান্তকর। ঝড়ে উড়ে যেতে পারে, গাছ চাপা পড়ে যেতে পারে।

বাপ-বেটা দুজনেই ভগবানের কাছে ব্যাকুল চিত্তে শুধু বাঁচবার দাবী জানাতে লাগলো।

গর্জনটা বাড়তে বাড়তে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার কমতে সুরু হল এবং ক্রমে ক্রমে তা কমে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টির গতি কমতে সুরু হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তা থেমে গেল।

পরাণ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে কাতুও। কাতু বাপের গা ঘেসে দাঁড়াল।

অন্ধকার ভেদ করে যতদূর দৃষ্টি যায় পরাণ সে পর্যন্ত চাইল। প্রথমে তার চোখে পড়ল আশেপাশের আম-জাম-কাঁটাল-নারিকেল গাছগুলি। গাছগুলি একটীও অক্ষত নেই। প্রত্যেকটীর সব ডাল ভেঙ্গে পড়ে গেছে, শুধু বিপর্যস্ত কাণ্ডগুলি বলির খাঁড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে—যেন দন্তোবিকীর্ণা রক্তপিপাসু রাক্ষসী! নারকেল-গাছগুলির অধিকাংশেরই মাথা ভেঙ্গে গেছে; যে দু' একটী কোন মতে মাথা বাঁচিয়ে ফেলেছে, তাদেরও অবস্থা ঝোড়ো কাকের মতো।

পরাণের মনে পড়ল জানাবাবুদের বি-এ পাশ ছেলেটীর সেদিনের কথা। নৌকায় বসে গল্প করতে করতে সে বলেছিল পৃথিবীর

সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব—মা ধরিত্রীর কনিষ্ঠ সন্তান—এই মানুষের পৃথিবীতে আসার বহুকোটী বৎসর পূর্বে উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল। প্রথমে নাকি মাটীর বক্ষ ভেদ করে উইঢিপির মতো উঁচু উঁচু কাণ্ড জন্মায়, তারপর নাকি তায় একে একে ডালপালা, পত্রপুষ্প, ফল জন্মায়। আজকের এই ডালপালাহীন কাণ্ডগুলি দেখে পরাণের মনে হল উদ্ভিদের প্রথম স্তরে ফিরে যাবার লক্ষণ সুস্পষ্ট—পৃথিবীতে জীবধ্বংস আসন্ন।

তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল সামনের মাঠের দিকে। সে যা দেখতে পেল তাতে তার একেবারে চক্ষুস্থির!

উঠানের নীচে রাস্তা দিয়ে জলস্রোত বইছে, মাঠের ধানগাছ জলে ডুবে গেছে। চতুর্দিকে জল, শুধু জল ··· জল ··· জল ···! কোথায় ছিল এতো জল! শুধু বৃষ্টির জলে তো এ সম্ভব নয়! এতক্ষণে সে বুঝতে পারল সেই রাক্ষসী গর্জনটার অর্থ! সাগরে 'বান' বেড়েছে! রাক্ষসী বান! তার হাত থেকে আর রক্ষা নেই! সে খাবে এই পৃথিবীকে! এরই মধ্যে মাঠ ডুবে গেছে, রাস্তায় জল উঠে গেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে এ বাড়ীঘর সব ডুবে যাবে! তারপর ··· তারপর তারাও ভেসে যাবে! লৌহ-মানব পরাণ কেঁপে ওঠল!

জীবনে এই প্রথম সে এই ভয়ংকর বান দেখল! মাঠ-ঘাট-পথ ডুবে-যাওয়া বান সে নিজেও কখনও দেখেনি, বাপ-ঠাকুরদার মুখেও কখনও শোনেনি।

মুসলমান পাড়া থেকে ভেসে আসছে একটা বীভৎস, মর্মন্তুদ মরণ চীৎকার—শিশু-নারীর কাতর ক্রন্দন, পুরুষের আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি, গরু-বাছুরের ভীত হাম্বারব! আসন্ন মৃত্যুর পূর্বকালীন এই কাতর চীৎকার—সে কী ভয়ানক! সবাই একসঙ্গে মরণ পথযাত্রী! কেউ কারো জন্য নয় এতোটুকু উৎকণ্ঠিত! স্বামীর মৃত্যুর কথা ভেবে স্ত্রী নয় এতোটুকু ব্যাকুলা, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা ভেবে স্বামী নয় সামান্যতম

চিন্তাকুল! পিতা এতোটুকু চিন্তিত নয় পুত্রের জন্য, পুত্রও এতোটুকু ব্যথিত নয় পিতার জন্য! প্রত্যেকেই ব্যাকুল, প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন! প্রত্যেকেই চায় আপন মূল্যবান প্রাণটা বাঁচাতে!

মানুষের আসল রূপটার পরিচয় পাওয়া যায় জীবনের এমনি এক চরম সংকটকালে। লক্ষ লক্ষ বছর পরেও মানুষের স্বার্থপরতায় পরিবর্তন হয়নি এতটকুও—সে যেখানেই বাস করুক, কুঁড়ে ঘরে কিংবা চুরাশিতলা প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে।

দূর থেকেও ভেসে আসছে মরণ কোলাহল! দক্ষিণের মানুষ, গরু, ছাগল সব ভেসে গেছে!

নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে পরাণ ভাবতে লাগলো অনেক কথাই, তার মনে পড়লো মৌলভী সাহেবের একটা কথা। পৃথিবী যখন পাপীতে পূর্ণ হয়, তখন আল্লা নাকি মহাপ্লাবন দ্বারা পাপীদের বিনাশ করেন। কোরাণে নাকি লেখা আছে, আল্লা একবার মহাপ্লাবন সৃষ্টি করে পৃথিবীর পাপীদের বিনাশ করেছিলেন। পৃথিবী হয়তো আজ পাপীতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই অসুরনাশিনী মহিষমর্দিনী 'সন্ধিপূজা' ক্ষণে মহাপ্লাবন বইয়ে দিয়ে পৃথিবীর পাপীদের বিনাসসাধনে ব্রতী হয়েছেন!

মরণ বিভীষিকার মধ্যে আতঙ্কে কাতু তার একমাত্র রক্ষক বাপকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠল, 'বাবুগো, মন্‌কার কী হবে ...'

পরাণ পুত্রকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কোলের দিকে টেনে নিল; কিন্তু কিছু বললো না। কারণ সে নিজেই জানেনা, তাদের কী হবে ...

'—বাবুগো, মন্নে যে মর্‌্যা যাব—'

পরাণ চমকে ওঠল, 'ভয় কী কাতু, আমি আছি ... চল, শাসমল বাবুদের বাড়ীতে পালি যাই, চল; পিরাণটা খুল্যা ফ্যাল—'

এ অঞ্চলে জমিদার শাসমলদের বাড়ীটাই একমাত্র পাকাবাড়ী এবং সেটি তিনতলা।

কাপড়টা ছেড়ে গামছাটা পরল পরাণ, তারপর পুত্রের হাত ধরে নামল রাস্তায়। পায়ে সে মালুম পেল জলের তীর গতির! রাস্তায় কোথাও জল এক হাঁটু। কোথাও বা এক কমর, ডালপালা পড়ে রাস্তাও অবরুদ্ধ, বিপজ্জনক। বহুকষ্টে সে সব এড়িয়ে পরাণ এগোতে লাগল। কাতুকে সে পিঠে নিয়ে নিয়েছে। কাতু হাত দুটো দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে, পা দুটো দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরেছে—ঠিক যেন বলদের পিঠে 'ছালা'র মত।

পরাণ এসে পৌঁছল পুতমারী খালের দক্ষিণতীরে। একদা কোনকালে এক ক্ষিপ্তা রমণী তার দুর্দান্ত পুত্রকে এই খালে ডুবিয়ে মেরেছিল; পুত্রহন্ত্রী সেই রমণীর অপকীর্তি আজো জড়িয়ে রয়েছে এই খালের নামের মধ্যে। এখান থেকে মাইল খানেক পশ্চিমদিকে খালের উত্তর পাশে শাসমল বাবুদের বাড়ী।

পরাণ ঠিক করল এইখানেই খালটা পেরিয়ে যাবে। উত্তর-পাশের বাঁধটা পি-ডব্লিউ-ডির, সেটা এ পাশের বাঁধের চেয়ে অনেক উঁচু ও চওড়া। ও বাঁধটা এখনও প্রায় ডুবে যায়নি। তাছাড়া এপাশের তুলনায় ওপাশে গাছপালা কম, ফলে ভাঙ্গা ডালপালায় রাস্তা বন্ধ হওয়ার সম্ভবনাও কম।

পরাণ দাঁড়াল। সে তাকাল খালের দিকে। খালটাও নেহাৎ কম চওড়া নয়, ছোট-খাটো একটা নদী। হলদী নদীর জোয়ার-ভাঁটা তাতে নিয়মিত খেলে।

পরাণের বুকটা কেঁপে ওঠল। জল দেখে সে জীবনে এই প্রথম ভয় পেল।

জলের প্রাণী যেমন জলকে ভয় করে না। পরাণও তেমনি জলকে কোনদিন ভয় করেনি। জোয়ার-ভাঁটায়, গ্রীষ্মে-বর্ষায় সমান-ভাবেই সে হলদী নদীর বুকে সাঁতার কেটেছে, ডুব দিয়েছে।

কুমীরের মতো সে ডুব দিয়ে আট-দশ মিনিট পরে একশ হাত দূরে ভোঁস করে ভেসে উঠেছে। তার হাত দুটো, পা দুটো যেন মাছের পাখনার মতো, তা দিয়ে তীরবেগে জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে পারে।

সেই পরাণ একটা খালে ভয় পেয়ে গেল।

না, ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। যেভাবে তরতর করে জল বাড়ছে, আর একটু পরেই মাথা ডুবি জল হয়ে যাবে, আর সেপারের বাঁধ ডুবে ঝাপান সুরু হবে।

পরাণ কাতুকে বললো, 'শক্ত কর‍্যা ধর। ভয় করিসনি—'

ভগবানের নাম স্মরণ করে সে সাঁতার কাটতে সুরু করল।

পরাণ এতোক্ষণে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারল স্রোতের গতিবেগ! এমন ভীষণ স্রোত-টান সে কোন দিন নদীর জোয়ার-ভাঁটায় পায়নি! সে সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। আর তার পিঠের ওপর কাতু কুমীরের বাচ্চার মতো তাকে জড়িয়ে ধরে রইল। স্রোতের টান যতোই তাকে তরতর করে টেনে নিয়ে চললো, ততোই সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল পরপারে তীরে ওঠবার। এইভাবে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যখন সে খালের মধ্যিখানে এলো, তখন স্রোত-টান তাকে প্রায় মাইল খানেক দূরে টেনে নিয়ে এলো।

কাতু তার পিঠের ওপর মরার মতো নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে। কাতু যদি তার পিঠের ওপর না থাকতো, তাহলে সে হয়তো এতোক্ষণে সেপারের তীরে ভিড়তে পারতো। পিঠের ওপর একজনকে নিয়ে এই স্রোতে সাঁতরিয়ে খাল পার হওয়া কী ভয়ানক কষ্টকর!

অথচ এই পরাণ নৌকাডুবির কত অসহায় শিশু-নারী-পুরুষকে উদ্ধার করেছে। নদীতে কত সময়ে কত নৌকাডুবি হয়েছে।

পরাণ দেখতে পেলেই অমনি ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ে ডুবন্ত মানুষকে পিঠে করে তুলে এনেছে।

এই তো দিন পনেরর আগের কথা। জানাবাবুদের সেই বি-এ পাশ বাবুর এক সহুরে বান্ধবীর নৌকায় বেড়ানর শখ হয়। ডিঙ্গিতে করে তারা বেড়াচ্ছিল। কীভাবে ডিঙ্গিটা হঠাৎ উল্টে যায়! জাফরকে হালটা ধরিয়ে দিয়ে পরাণ ঝপাং করে লাফিয়ে পড়েছিল জলে। তারপর মেয়েটিকে অজ্ঞান অবস্থায় নিজের নৌকায় তুলে এনেছিল।

আর সেই পরাণই এখন নিজের সন্তানকে পিঠে রাখতে কষ্টবোধ করছে।

পরাণ বাঁচতে চায়, আর বাঁচাতে চায় নিজের সন্তানকে— নিজের জীবন-সাক্ষরকে।

পরাণ আপ্রাণ শক্তিতে হাত-পা দিয়ে জল টানতে লাগল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা অবশ শীথিল হয়ে পড়ল! সে আর পারে না জল টানতে! স্রোতের টানে তরতর করে শুধু ভেসে যেতে লাগল।

একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ সমূলে উপড়ে খালের মধ্যে পড়ে গেছে; ফলে সেখানটায় জলে সৃষ্ট হয়েছে ভয়ংকর ঘূর্ণি। পরাণ সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেল, আর একটা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মতো ঘূর্ণির পাকে পাকে চরচর ঘুরতে লাগল।

কাতু তার পিঠে জোঁকের মত লেপটে পড়ে রইল আর হাত দুটো দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইল। মৃত্যুভয়ে সে মৃত্যুবৎ। তার জন্মদাতা পিতা তার রক্ষাকর্তাও এখন এই নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে সেই যে তার একমাত্র অবলম্বন। সেই তার একমাত্র জীবন-রক্ষক। তার বাপ যদি রক্ষা পায়, সেও যে রক্ষা পাবে: তার বাপ যদি বাঁচে, সেও বাঁচবে।

আসন্ন মৃত্যুকালে মানুষ বাঁচবার জন্যে যেমন মরিয়া হয়ে ওঠে,

পরাণও তেমনি বাঁচবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করতে লাগল। সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল ঘূর্ণির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়তে। সে জানে ঘূর্ণির ভিতর জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা।

ঘূর্ণির মধ্যে পাক খেতে খেতে হঠাৎ এক সময় সে ডুবে গেল।

পরাণ পারল না আর নিজেকে সামলাতে, পারল না আর নিজেকে রক্ষা করতে, পারল না বাঁচাতে নিজের সন্তানকে। পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পারল না নিজের জীবন-সাক্ষরকে, নিজের প্রাণ-প্রতীককে, নিজের রক্ত-চিহ্নকে ···

সে মরছে, মারছে তার সন্তানকেও। একই সঙ্গে পিতা-পুত্রের সলিল-সমাধি।

সাঁপুড়ের মৃত্যু সাপের হাতে, নাবিকের মৃত্যু জলে ···

হায়রে জীবন ···

ঘূর্ণির পাকে পাক খেতে খেতে পরাণ তলিয়ে যেতে লাগল—তার মনে হল তারা যেন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে ···

সে যতোই তলিয়ে যেতে লাগল, কাতু ততোই তার বাহু দিয়ে তার গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে লাগল ···

কাতু বাঁচতে চায় ···

পরাণের মনে হল তার আগমনে পাতালের ক্রুদ্ধ বাসুকীনাগ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে, আর দেব-দানবে তার লেজ ও মাথা ধরে দুদিক থেকে টানাটানি করছে; ফলে পরাণের দেহ থেকে তার মাথা যেন ছিঁড়তে বসেছে! কণ্ঠনালীর প্রক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দম যেন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে; প্রাণ যেন তার বেরিয়ে যায় ···

কিন্তু পরাণ বাঁচতে চায় ···

সে নিজের হাত দুটো দিয়ে মুহূর্তমধ্যে ঝটকা দিয়ে পুত্রের হাত দুটো নিজের গলা থেকে ছাড়িয়ে দিল!

ঘূর্ণির তোড়ে পলকে কাতু পিতার দেহ থেকে বিচ্যুত হল এবং ঘূর্ণিরই পাকে সে জলের ওপর ভেসে ওঠল আর করুন কাতর কণ্ঠে বারেক শুধু বলে ওঠল, বাবুগো ! মোকে বাঁচা …

পরক্ষণেই ঘূর্ণির পাকে জলের অতল তলে কোথায় তলিয়ে গেল !

মুক্ত পরাণ ভেসে উঠল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে জোর টান দিয়ে ঘূর্ণির বাইরে বেরিয়ে এল।

পরাণ তীরে উঠল।

তারপর …

তারপর পরাণ আর পারল না চলতে, পারল না যেতে শাসমল বাবুদের বাড়ীতে। শুধু ঘূর্ণির দিকে নিশ্চল নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

পরাণের চারিদিকে বিভীষিকা—মরণের বিভীষিকা, অন্ধকারের বিভীষিকা ! মরণ যেমন ভয়ানক কুৎসিৎ কালো, তেমনি কুৎসিৎ কালো আজকের এই অন্ধকার—যেন সূর্যদেব বহুদিন এ পথে ভ্রমণ করেন নি ; তাই অন্ধকার ঘণীভূত হতে হতে আজকের এই অবস্থায় পৌঁচেছে।

সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রাণহীন পাষাণের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে তার চেয়ে কুৎসিৎ কালো সাতফুট দীর্ঘ ভীষণাকৃতি পরাণ—যেন যমদূত ; মৃত কাতুর আত্মাকে যমলোকে নিয়ে যেতে এসেছে !

পাষাণ পরাণের নির্নিমেষ নেত্রকোণ থেকে খালের জলে গড়িয়ে পড়ছে তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা।

পরাণ কাঁদছে …

পরাণ কাঁদছে আর ভাবছে : ভাবছে অনেক কথা … ভাবছে নিজের কৃতকর্মের কথা, নিজের পাপকর্মের কথা—যে পাপ তাকে চিরকালের জন্ত এই খালের নামের সঙ্গে হয়ত জড়িয়ে রাখবে …

সে ভাবছে ···

··· বহুদিন পরে কোন বিদেশী পথিক এখানকার কোন লোককে এ খালের নাম শুধালে, সে লোকটী তখন পথিককে বলবে, এ খালের নাম 'পুতমারা' খাল। আর এক হৃদয়হীন পুত্রহন্তা পিতার নিষ্ঠুরতার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সে আরো বলবে, বহুদিন আগে এক দুর্যোগের রাত্রিতে এক শয়তান পিতা তার অসহায় নিরপরাধী বালক পুত্রকে এ খালে ডুবিয়ে মেরেছিল ···

··· সেদিনের এমনি এক বর্ষাঘন দুর্যোগের রাত্রিতে বহুদিন অদর্শনরত পুত্রস্নেহাতুর কোনো পিতা গৃহের পথে যখন এইখানে এসে পৌঁছবে, তখন এই কাহিনী তার মনে উদিত হলে সে হঠাৎ শিউরে উঠবে; তারপর এই বানপূর্ণ খালের মধ্যিখানের ছল-ছল, কল-কল শব্দের মধ্যে সে শুধু শুনতে পাবে এক অসহায় জিজীবিষু বালক কণ্ঠের কাতরোক্তি, বাবুগো! মোকে বাঁচা; বাবুগো! মোকে বাঁচা ···

প্রগতির আত্মহত্যা

—বা! বেশ সুন্দর টুকটুকে ছেলেটি তো—

ছেলেটিকে তিনি যেন কোথায় দেখেছেন—চিনি চিনি করেও চিনতে পারছেন না। স্মৃতির রোমন্থন করেন, কোথায় ··· কবে ··· ?

মনে একাগ্রতা এনে সভানেত্রী মালবিকা মুখার্জী কুঞ্চিত দৃষ্টি দিয়ে ছেলেটিকে চিনতে চেষ্টা করেন—উঁহু, মনে পড়ছে না তো—

তার দিকে সভানেত্রীর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় কিশোর ছেলেটিও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যায়। আজকের এই সভা তাকে নিয়ে—তাই তার লজ্জাটা আরো বেশী।

সভানেত্রীর কৌতূহল বেড়ে চলে। তিনি ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। তরুণকুমার লজ্জায় আরো আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুখ ঈষৎ নীচু করে সভানেত্রীর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলো।

'থাক, বাবা, হয়েছে,' বলে মালবিকা দেবী তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। 'তুমি তো খুব ভালো ছেলে, ভগবান তোমার উন্নতি করুন ··· তুমি কাদের, তোমার বাবা কি করেন?'

'বাবা, এই কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল—'

'নাম কী—?'

'শ্রীযুক্ত বাবু কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ—'

ভীষণ বজ্রপাতে বিদ্যুতের বায়বীয় সংস্পর্শে আমাদের দেহের ধমনীগুলো যেমন হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে মুহূর্তমধ্যে একটা ভয়ার্ত শিহরণ সারাদেহে সঞ্চারিত করে, তেমনি এই নাম মালবিকা দেবীর সারাদেহে

তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে তাঁর দেহকে মুহূর্তের জন্ম শিহরিত করে তুললো। নিজের পদমর্যাদা ও সম্ভ্রম তাঁকে স্থানকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। মনের অস্থির চাঞ্চল্যকে তিনি বাইরে প্রকাশ পেতে দিলেন না; কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে কাল-বৈশাখীর যে মত্ত ঝড় উঠলো তা যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণনে তাঁকে উড়িয়ে নিতে চায় কোন এক সুদূর রহস্য-লোকে।

•

ঘটনাস্থল বাংলার এক মফঃস্বল সহরের কলেজিয়েট স্কুল। এই স্কুলের সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবনে তরুণকুমারই প্রথম ছাত্র যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হয়েছে প্রথম। স্কুল থেকে তাকে আশীর্ব্বাদী-অভিনন্দন দেবার জন্ম এই সভার আয়োজন। স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট মালবিকা মুখার্জী সভানেত্রী হয়েছেন। তিনি এই জেলার 'ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট'—সম্প্রতি বদলী হয়ে এসেছেন।

সভার কাজ শীঘ্র শেষ করে তিনি তরুণকে বল্লেন, 'চলো খোকা, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসি—'

তরুণকুমার বিশ্বাস করতে চায় না—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যাবেন কিনা তাদের বাড়ী বেড়াতে। তাই অবিশ্বাসী চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ম্যাজিষ্ট্রেট মালবিকা দেবীর বুঝতে দেরী হয় না তরুণ কুমারের এই বিস্মিত দৃষ্টির অর্থ। তাই তিনি তরুণকুমারের চিবুকে হাত দিয়ে হেসে বল্লেন, 'তোমার মতো সন্তান যে-মায়ের তার সঙ্গে আলাপ করা সৌভাগ্যের কথা।'

স্বাভাবিক লজ্জায় তরুণকুমার মাথা নত করলো।

তরুণকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মালবিকা দেবী 'কারে' উঠে ড্রাইভারকে আদেশ করলেন জোরে চালাতে। পশ্চাতে ধুলি-ধূসর রাজ্য সৃষ্টি করে গাড়ীটা যেন ডানা বেঁধে শূন্যে উড়ে যেতে লাগলো তরুণকুমারের

বাড়ীর দিকে ; কিন্তু মালবিকা দেবীর মন উড়ে চলেছে পশ্চাতের কোন এক সীমাহীন চিন্তারাজ্যে।

মালবিকা দেবীকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে তরুণকুমার মায়ের সন্ধানে তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তরে গেল। মাকে সে রান্নাঘরে বৈকালিক জলখাবার তৈরী করতে দেখতে পেল। সে ঘাড় নামিয়ে মার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানা পর্যন্ত কথা যেন না যায় এমনি ফিস-ফিসিয়ে বল্লো, 'মা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এসেছেন।'

পুলিশের নাম শুনলে মানুষের মনে যে স্বাভাবিক আতঙ্ক সৃষ্ট হয়, বকুলমালা দেবী তার হাত থেকে রেহাই পেলেন না। কনষ্টেবল নয়, দারোগা নয়, একেবারে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আগমন শুনে তিনি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। হাতের কাজ ফেলে রেখে তিনি তরুণের মুখের দিকে ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম শুনে মা যে ভয় পেয়ে গেছেন তাঁর বিস্মিত মুখ দেখে তরুণকুমার তা বুঝতে পারলো। মাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললো, 'আমি ফার্ষ্ট হয়েছি বলে উনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন, উনি আমাদের স্কুলের প্রেসিডেন্ট, ওঁরই মোটর গাড়ীতে তো আমি এলাম।'

বকুলমালা দেবী আশ্বস্ত হলেন। তিনি পুত্রকে বল্লেন, 'ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে একটু অপেক্ষা করতে বল, ওঁর আসার সময় হয়ে গেছে। তুই গিয়ে ততক্ষণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বোস্।' বলে তিনি গামছায় হাত মুছতে লাগলেন।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন—বাবার সঙ্গে নয়, তুমি এসো না!' সে মায়ের হাত ধরে টানতে লাগলো। সে ভাবলো—তারই জন্য তো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তার বাড়ীতে এসেছেন—সুতরাং তারই দায়িত্ব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

পুত্রের সরলতায় বিমুগ্ধ বকুলমালা দেবী পুত্রকে স্নেহ করে বললেন, 'হাত ছেড়ে দে, খোকা, আমার কী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাওয়া চলে।'

এতোক্ষণে তরুণকুমার বুঝতে পারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় মার আপত্তিটা কোথায়, তাই সে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে নেবার জন্য হেসে বলে উঠলো, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো পুরুষ-মানুষ নন, মেয়ে-মানুষ।'

বিস্ময়ের আর একটা ধাক্কা এসে লাগলো বকুলমালা দেবীর মনে। মেয়ে-মানুষ যে ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে তা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সামান্য লেখাপড়া জানেন। স্বামী তাঁকে পছন্দ করে গৃহে এনেছেন। তারপর এই সতের বছর স্বামী-পুত্র সংসার নিয়েই আছেন—এর বেশী তিনি কিছু জানেন না—জানার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

... কিন্তু তাঁর কৌতূহল হঠাৎ-বৃষ্টিতে-পাহাড়িয়া-ছোটনদীর খরস্রোতের মতো তীব্র হয়ে উঠলো—কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিয়ে অতি সন্তর্পণে পুত্রের পিছুপিছু বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

খানিক পরে কল্যাণবাবু গোটাকয়েক বই হাতে ঘরে প্রবেশ করলেন। বকুলমালা দেবী স্বামীর সঙ্গে মালবিকা দেবীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর মালবিকা দেবীর দিকে চেয়ে বললেন, 'দিদি, এবার আপনারা আলাপ করুন, আমি এক্ষুণি আসছি।' বকুলমালা দেবী দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তরুণকুমার মাকে অনুসরণ করলো।

মালবিকা দেবীকে দেখে কল্যাণবাবু একেবারে স্তম্ভিত, হঠাৎ কোন স্বপ্নলোক থেকে মায়াবলে তাঁর যৌবনের মালবিকা আজ তাঁর গৃহে আবির্ভূত। বিস্মিত কল্যাণবাবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি-নমস্কারে

তাঁর হাত যন্ত্রের মতো একটু তোলা ছাড়া মুখ দিয়ে কোন কথা বলতে পারেন নি। সুদীর্ঘকালের শিক্ষকতায় যিনি লাখ লাখ কথা বলেছেন, তিনি আজ একেবারে বাক্যহীন; শুধু স্তব্ধ দৃষ্টি দিয়ে মালবিকা দেবীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু মালবিকা দেবী কল্যাণবাবুকে দেখে বিশেষ বিস্মিত হন নি। বকুলমালা দেবীর কাছে তাঁদের সংসার জীবনের কাহিনী শুনে, স্ত্রীপুত্রসহ কল্যাণবাবুর ফটো দেখে তিনি পরিবেশকে অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন। নিজেও অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কল্যাণবাবুর উপস্থিতির জন্যও প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি হঠাৎ কোন কথা বলতে পারলেন না।

দুজনে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিস্তব্ধ গৃহের দেওয়াল ঘড়ির ঠক্ ঠক্ শব্দ তাঁদের কানের ভিতর দিয়ে মর্মে ঘা দিতে লাগলো।

দণ্ডায়মান কল্যাণবাবুর বিস্ময় বিমুগ্ধভাব কাটিয়ে তোলার জন্য মালবিকা দেবী অবশেষে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোসো।'

স্ত্রীর নাটকীয় প্রস্থানে এবং তার সঙ্গে পুত্রের চলে যাওয়ায় মালবিকা দেবীর সামনে কল্যাণবাবু নিজেকে বড্ড বিব্রত বোধ করছিলেন। মালবিকা দেবীর কণ্ঠস্বরে তিনি নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেলেন। টেবিলে বইগুলো রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

মালবিকা দেবী হাসিমুখে বললেন, 'আমাকে দেখে বুঝি খুব অবাক হয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ, একটু হয়েছি বৈকি,'

'না-হওয়াটাই তো অস্বাভাবিক। আঠার বছর পরে আমাকে তোমার বাড়ীতেই তুমি দেখতে পাচ্ছ—যা তুমি কোনদিনই ভাবতে পারোনি।'

'এখানে এসেছো কী সূত্রে তা বুঝেছি—আমার মুখ্যু পুত্রকে স্নেহ করে তো? যাক্ ওকথা, তুমি এখন কেমন আছো?'

'কেমন আছি?' মালবিকা দেবী একটু হাসলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরোতে ছিল, 'ওকথা নাই বা জিগ্যেস করলে' কিন্তু বেরিয়ে এলো, 'হ্যাঁ, একরকম আছি।'

'একরকম কেন? তুমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—জেলার হর্তাকর্তা-বিধাতা ··· অর্থও তেমনি ··· তোমার আবার দুঃখ কিসের ···

'তা তুমি ···' মালবিকা দেবীর মনের কথা মুখেই রয়ে গেল। তরুণ কুমারকে জলের গ্লাস ও বকুলমালা দেবীকে খাবারের থালা হাতে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি প্রসঙ্গান্তরে গেলেন।

আষাঢ়ের আকাশ তার স্বাভাবিক নিয়মে, নব পোষাকে সারাদেহ আচ্ছাদিত নববধূর মত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। সন্ধ্যার আগমনে তার ঘনঘটা আরো বেড়ে চল্লো। আনন্দহাস্যোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মালবিকা দেবী এমনি সময়ে কল্যাণবাবুর বাড়ী থেকে বিদায় নিলেন।

গাড়ীর তলার চাকা আপন মেরুদণ্ডের উপর সামনের দিকে ঘুরে ঘুরে গাড়ীকে পূব দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে—আর সেই চাকার উপরে গাড়ীর ভিতরের মালবিকা দেবীর মন পেছনে-ফেলে-আসা আপন অতীত জীবন-নাট্যের পরদা তুলে চলেছে ··· মনে পড়ে তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কাহিনী ··· মনে পড়ে তাঁর লণ্ডনের স্মৃতি ··· তাঁর জন্ম হয়েছিল লণ্ডনে। তাঁর বার বছর বয়সে তাঁরা ফিরে আসেন কলকাতায়। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার—প্রচুর প্রসার ও পয়সার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন নিজেকে। ফলে তাঁদের জীবন-তরী বয়ে যেত য়্যাংলো-বেঙ্গলী মন্দাক্রান্তা ছন্দে।

এরি মাঝে এক সময়ে হঠাৎ নেমে আসে তাঁর জীবনে বিধাতার অভিশাপ। তাঁর এম-এ পাশ দিদি তাঁর পিতার বন্ধুপুত্র ডাক্তার মহম্মদ হোসেনের সঙ্গে যখন পালিয়ে গেলেন পাঞ্জাবে, তখনই তাঁর পিতা তাঁর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর বিয়ে দিলেন হাতের-কাছে-পাওয়া-পাত্র এক অধ্যাপকের সঙ্গে। তাঁর আশা ছিল, হয়তো তিনি পারতেন, কোন আই-সি-এসের অনামিকায় আংটী পরাতে। কিন্তু তাঁর দিদির পাপকর্মের শাস্তি পেতে হয়েছিল তাঁকে— তখনই। অধ্যাপকের নগণ্য আয় তাঁর জীবন-যাত্রার পক্ষে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর জেনে তিনি প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং যথাসময়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পেয়ে বেচারী স্বামীকে পরিত্যাগ করে কর্ম্মস্থলে চলে গেছলেন। তারপর ···

'মেম সাব—' ড্রাইভারের ডাকে মালবিকা দেবীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হোলো। গাড়ী যে কখন তাঁর কোয়ার্টারের সামনে এসে থেমেছে তা তিনি জানেন না। শব্দ অনুসরণ করে মুখ তুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলেন ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নামলেন। দ্বারোয়ানকে জানালেন—তাঁর শরীর খারাপ, সাক্ষাৎ-প্রার্থীরা যেন ফিরে যায়; আর বয়কে কিছু খাবেন না জানালেন।

সমস্ত শক্তি যেন তাঁর নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে। দেহটাকে টানতে টানতে কোনরকমে শোয়ার ঘরে আনলেন। সোফায় নিজেকে অসাড়ের মতো একেবারে এলিয়ে দিলেন।

বাইরে বর্ষণ সুরু হোলো।

আর মালবিকা দেবীর অন্তরেও আষাঢ়ের বর্ষণের মতো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চিন্তা ঘনঘটায় দেখা দিল। পূর্ব-চিন্তার সূত্র ধরে তিনি ভাবতে লাগলেন ··· সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল—তাঁর শক্তিমান ডেপুটিত্বের উপর তার দরিদ্র স্বামীর দুর্বল অধ্যাপকী

কর্তৃত্বই নারীর উপর পুরুষের সেই চিরকালীন কর্তৃত্ব। তাই বিচ্ছেদের ক্ষণে সংসারে সহধর্মিণীর স্থান ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর আর্য-দর্শন থেকে শ্লোক উদ্ধৃতির উত্তরে তিনি পশ্চিমী দর্শন থেকে নারী-প্রগতির পক্ষে অনেক বড়ো-বড়ো বাক্য আউড়েছিলেন … তারপর ডেপুটী হয়ে কত সহর, কত গ্রাম, কত নদ-নদী দেখে বেড়িয়েছেন, কত বিচিত্র মানুষের দেখা পেয়েছেন, সভা-সমিতি করে কত বাহবা পেয়েছেন, নিজ এলাকায় শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখায় কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন, দুষ্টদের দমন করে সুনাম পেয়েছেন, সর্বত্র যথেচ্ছ সেলাম পেয়েছেন, ব্যাংকে টাকা জমিয়েছেন, প্রমোশন পেয়েছেন, খেলেছেন, খেয়েছেন—অর্থাৎ একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী-রূপে জীবনটাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করেছেন—কিন্তু এরই বিপরীত দিকে জীবনের যে অমৃতময় ফলপ্রবাহ চলেছে সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন। এই মধ্যাহ্ন-জীবনে আজ ঐ কিশোর বালক জীবনের সেদিকের দ্বার তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দিল। যে স্বামীকে তিনি আঠারো বছর আগে ত্যাগ করেছিলেন, আজো তো সে ঠিক তেমনি আছে—কিন্তু সে যা পেয়েছে—তার যে তুলনা নেই। সে পেয়েছে পতিব্রতা গৃহবধূ, গৃহবধূ পেয়েছে প্রেমাসক্ত স্বামী; আর উভয়ে মিলনে যা পেয়েছে—সে যে অমৃতফল। বিশাল এই পৃথিবীর এককোণে এই যে ছোট সুখনীড়—এর যে তুলনা নেই—এই তো স্বর্গ … কিন্তু এই স্বর্গ রচনার ভার তো একদিন তাঁরই হাতে ছিল, তিনিই তো এই স্বর্গের সম্রাজ্ঞী হতে পারতেন, তরুণকুমারের মা হতে পারতেন … হায়! নিজ কর্মদোষে তিনি আজ নারী জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ থেকে বঞ্চিত … এতোদিনের এতো বাহবা-প্রশংসা-সম্মান-প্রতিপত্তি-অর্থ আজ তাঁর কাছে মিথ্যা, ভয়ানক মিথ্যা বলে মনে হল; আজ তাঁর কাছে একমাত্র সত্য

হয়ে উঠলো একটি সুখনীড়, প্রেমাসক্ত একজন স্বামী, বলিষ্ঠ দু' একটি সন্তান ··· তাঁর মনে পড়লো তাঁর পশ্চাতে কতলোক কেহ কুমারী, কেহ স্বামী-পরিত্যক্তা বলে তাঁকে বিদ্রূপ করেছে—সে সবকে সেদিন তিনি কোন আমল দেন নি; কিন্তু আজ এই সামান্য কথাগুলো তাঁকে যেন তীরের মত বিঁধতে লাগলো ··· নিজের ভাবী-জীবনের শূন্য হাহাকারের কথা ভেবে তাঁর নিজের জীবনের প্রতি এলো গভীর বিতৃষ্ণা ··· পৃথিবী থেকে যেদিন তিনি হবেন অপসৃত; সেদিন কারো কপোল বেয়ে পড়বে না একবিন্দু অশ্রু, কারো মনে বাজবে না এতটুকু ব্যথা, কারো হৃদয় হবে না এতোটুকু জর্জরিত; পৃথিবীতে থাকবে না তাঁর কোন প্রিয় পরিজন, রইবে না একফোঁটা রক্তের ধারা, একটিও হৃদয়ের স্বাক্ষর। কপোল বেয়ে তপ্ত অশ্রুর বড়ো বড়ো ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগলো।

নিকটে কোথাও পিলে-চমকানো বাজ পড়লো। মালবিকা দেবী চমকে উঠলেন। সোফা থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। শোয়ার উদ্দেশ্যে পালঙ্কের দিকে যেতে লাগলেন। ডানপাশের ছ'ফুট দীর্ঘ আয়নায় নিজের মূর্ত্তি ভেসে ওঠায় তিনি সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। এতোদিন এইখানে দাঁড়িয়ে যে চোখে নিজের দেহে যে বস্তু দেখেছেন, আজ তাঁর সে চোখ বদলে গেছে। তিনি নূতন দৃষ্টিতে নিজের দেহে নূতন বস্তুর সন্ধান করতে লাগলেন ··· সন্তানের মা হবার শক্তি কি তাঁর দেহে আদৌ নেই ··· উর্ধ্বাঙ্গের পোষাক খুলে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন ··· নিশ্চয়ই তিনি এখনো সন্তানের মা হতে পারেন ··· কিন্তু তার আর সম্ভাবনা কোথায় ··· তিনি পালঙ্কের দিকে ঘুরলেন।

তারপর তিনি পালঙ্কের বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

তারপর …

তারপর তিনি প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে স্থাপন করলেন এক অভিনব আত্মীয়তা—সপত্নী-পুত্রকে করলেন ধর্মপুত্র ; স্নেহে তাকে করে তুল্লেন আপন গর্ভজাত সন্তান। পোষাক-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায় অধ্যাপক-সন্তানকে করে তুল্লেন, ম্যাজিষ্ট্রেট-নন্দন। অধ্যাপক কল্যাণ বাবু মালবিকা দেবীর এই বাড়াবাড়িতে লজ্জিত হলেন যতোখানি, ভিতরে ভিতরে অপমানও বোধ করলেন ততোখানি। তিনি তাঁকে বিনয়ের সহিত নিষেধ করলেন। কিন্তু বর্ষার নদীর স্রোত তার গতিপথের বাধা উপল-খণ্ডকে সরিয়ে দিয়ে, ডুবিয়ে দিয়ে যেমন নিম্নদিকে তীব্রবেগে বইতে থাকে ; তেমনি মালবিকা দেবীর সারাজীবনের অতৃপ্ত জননী-হৃদয়ের হঠাৎ-জেগে-ওঠা দুর্জয় সন্তান-বাৎসল্য কল্যাণবাবুর তুচ্ছ নিষেধকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল কল্যাণবাবুকে মালবিকা দেবীর কক্ষে। দুটী সোফায় মুখোমুখি তাঁরা দু'জনে যে বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তারই জের ধরে মালবিকা দেবী বল্লেন, 'তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে …'

'ভিক্ষা ! … আমার কাছে ! … কল্যাণবাবু অবাক হলেন।

'হ্যাঁ, তোমার কাছে—'

'এক সামান্য গরীব শিক্ষকের কাছে এক প্রবল প্রতাপান্বিত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ভিক্ষা—এ যে দীন প্রজার কাছে রাজার ভিক্ষা—'

'থাক্। আর ঠাট্টা করতে হবে না—'

'ঠাট্টা ! … যা সত্যি তাই বললুম—'

'থাক্, সত্যি বলে আর কাজ নেই—যা বল্লুম—?'

'ভিক্ষাটা কি শুনি—'

'তরুণকুমারকে আমাকে দিতে হবে'—আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই মালবিকা দেবী কল্যাণবাবুকে আজকে সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং কথাবার্তার পর এতোক্ষণে আপন অন্তরের এই একান্ত কথাটি স্বামীর কাছে প্রকাশ করলেন।

'ওকে তো তুমি নিয়েছ—'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেরকম নয়, একেবারে আমাকে দিতে হবে, ওকে আমি 'কন্টিনেন্ট' থেকে শিক্ষা দিইয়ে আনবো—ওকে আমি দেশের একজন সেরা মানুষ করে তুলতে চাই—' মালবিকা দেবীর চোখে, মুখে কথায় একটা উজ্জ্বল আগ্রহ।

কল্যাণবাবু বিস্ময়াহত। তিনি নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মালবিকা দেবীর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন ... এ কী সেই মালবিকা—যে তাঁকে অধ্যাপনা ছেড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মস্থলে ঘুরে ঘুরে বামা-স্বামীর মতো স্ত্রীর উপজীবী হবার অনুরোধ করেছিল ... একী সেই—যে শিক্ষকতাকে অক্ষমের পেশা বলে সদম্ভে ঘোষণা করেছিল ... একী সেই—যে জীবন-যাপনের মান বাড়ানোর জন্ত স্বামীকেও পরিত্যাগ করেছিল ... একী সেই—যে মাষ্টারের ঘরের ছেলেমেয়েরা মূর্খ হবে বলে শিক্ষক স্বামীকে কাছে ঘেঁষতে আমল দিত না। একী সেই মালবিকা ... একী এখনো বিশ্বাস করে শিক্ষকের সন্তানরা অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষা পায় না; তাই কী করুণা করে তরুণকে পোষ্যপুত্র করে কন্টিনেণ্টে পাঠাতে চায় ... এর একটা উপযুক্ত উত্তর তাঁর মুখে এসেছিল; কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে চুপ করে মালবিকার দিকে পূর্ববৎ চেয়ে রইলেন।

'কী ... উত্তর দিচ্ছ না যে—'

'ওতো শুধু আমার নয়—'

'তুমি রাজী আছো কীনা বলো—'

'বাপ-মা যত গরীব হোক, তাই সন্তানকে কাউকে দিয়ে দিতে পারে না। আমি গরীব, নাই পারলাম ওকে কন্টিনেণ্টে পাঠাতে, মুখ্যুসুখ্যু হয়ে যদি আমাদের কাছে থাকে—এর চেয়ে আমাদের কাম্য, এর চেয়ে আমাদের বড়ো আর কিছুই নেই'—কল্যাণবাবুর কণ্ঠস্বরে বিচলিতভাব প্রকাশ পেল।

মালবিকা দেবী কল্যাণবাবুর পা স্পর্শ করে বল্লেন, 'তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—' তার আর বলা হোল না; কল্যাণবাবু মালবিকা দেবীর হাতটা টপ করে ধরে পা সরাতে সরাতে বল্লেন, 'ছি! ছি! একী করছো!'

'তুমি যা মনে করছো, সত্যি আমি তা মনে করিনি। কেন যে তরুণকে আমি চাই—তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।' তাঁরও কণ্ঠস্বরে বেশ আর্দ্রতা।

'আমাদেরও তো ঐ একটিমাত্র সন্তান; ওকে যদি তোমাকে দিয়ে দিই—আমরা কী নিয়ে বাঁচবো—।' কল্যাণবাবুর কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির সুর।

হঠাৎ মালবিকা দেবী নতজানু হয়ে স্বামীর কোলে মুখ রেখে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলতে লাগলেন, 'তরুণকে দিলে না, তবে আমাকে একটি সন্তান দাও, আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি, আমাকে ক্ষমা করো, আমি চাকরী ছেড়ে দেবো, তোমার কাছে ফিরে যাবো।'

বিষাক্ত সর্প-দংশনে মৃত্যুভয়ে মানুষ যেমন বিবর্ণ হয়ে যায় হঠাৎ মালবিকা দেবীর এই ব্যাপারে কল্যাণবাবুও তেমনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন। ক্ষণকাল তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না।

'একী ছেলে-মানুষী করছো; তুমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নও!'

'না, না, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট নয়, তোমার স্ত্রী।'

'বেশ, এখন ওঠে বসো—চাকর-বাকর যদি এসে পড়ে—'

'আগে আমার কথার উত্তর দাও—' তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। বন্ধ্যা রমণী সন্তান কামনায় শিব-ঠাকুরের কাছে মনে মনে যে ব্যাকুল কাতর আবেদন জানায়, সে ব্যাকুল কাতর আবেদন মালবিকা দেবীর চোখে মুখে ফুটে ওঠলো। কল্যাণবাবু সে দৃষ্টি থেকে নিজের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

নিরুত্তর স্বামীর অন্যদিকে মুখ ফেরানোয় মালবিকা দেবী নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না; তিনি স্বামীর কোলে মুখ গুঁজে নীরব ক্রন্দনে শুধু মর্ম-বেদনা স্বামীকে জানাতে লাগলেন।

নির্বাক কল্যাণবাবু স্ত্রীর মাথায় শুধু হাত বুলোতে লাগলেন।

রমণী প্রধানতঃ নারী—আর তার নারীত্ব বিকশিত হয় প্রিয়ারূপে, জননীরূপে। যে নারী প্রিয়া হতে পারল না, যে নারী জননী হতে পারলো না—তার মতন করুণ বিড়ম্বিত নারী পৃথিবীতে আর দু'টি নেই। মালবিকা দেবীর 'ষ্টীল ফ্রেম'-এর ম্যাজিষ্ট্রেটী নির্মোক থেকে এতোদিন পরে যে সোহাগভরা প্রিয়া, স্নেহময়ী জননী আত্মপ্রকাশ করতে পারে ছাত্র-পড়ানো বুদ্ধি দিয়ে কল্যাণবাবু তা সহজে বুঝে উঠতে পারলেন না—তিনি মনে করলেন, এটা খেয়ালী মালবিকার আর একটি নূতন খেয়াল ··· কিন্তু সে যা হোক, এখন কী করে এই খেয়াল থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। মুখে তিনি নরমস্বরে বল্লেন, 'মিলি, আমাদের এ অবস্থায় যে দেখবে, সে ভারী অবাক হয়ে যাবে। ওঠে বসো'—বলে তিনি নিজে তাঁকে তুলে নিজের কাছে বসালেন। তারপর বল্লেন, 'শান্ত যদি না হও, আমার কথা শুনবে কি করে।'

মালবিকা দেবী আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। স্বাভাবিক হয়ে উঠে বল্লেন, 'এবার বল।'

'তুমি যে আমার কাছে ফিরে যেতে চাইছো—তা কী করে হয়—'

'কেন হবে না ···'

'তা তো তুমিও জানো—একবার যে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছ, তাকে আর ফেরানো যায় না।'

'তুমিও ত আমার খোঁজ করোনি—সে যাক, এখনো তা ফেরানো যায়। 'আদালত থেকে আমার নামে কোন ত্যাগপত্র পাওনি; সুতরাং হিন্দু আইনে এখনও তুমি আমার স্বামী—তোমার উপর আমার পূর্ণ অধিকার আছে।'

'এতোদিন পরে সেই অধিকারের দাবীতে আর একজনের অধিকার কেড়ে নিতে চাচ্ছ—'

'কেড়ে নেব কেন ··· হিন্দু-সমাজে সতীন নিয়ে ঘর-করা নতুন নয়—'

'কিন্তু শিক্ষিত আধুনিক সমাজে তা ভীষণ বর্বরতা—আমার চেয়ে তা তুমি বেশ ভালো বোঝো—'

'কিন্তু আমি তো তা চাচ্ছি—'

'কিন্তু বকুলেরও তো একটা মতামত আছে—'

'সে কী জানেনি আমাদের সম্বন্ধের কথা?'

'না, তোমার আমার সম্বন্ধের কথা বলা তো দূরের কথা—আমার যে আর একবার বিয়ে হয়েছিল—তাও তাকে জানাইনি। সে জানে সেই আমার প্রথম ও শেষ স্ত্রী।'

মালবিকা দেবী অবাক!

তারপর তিনি বল্লেন, 'বেশ, আমিই তাকে আমার কথা জানাবো—'

'না—না—না, দয়া করে তা করোনা; এতদিন পরে সে যদি একথা জানতে পারে—আমার উপর থেকে তার সারাজীবনের সব বিশ্বাস, সব শ্রদ্ধা, সব প্রীতি চলে যাবে—' হঠাৎ তিনি মালবিকা দেবীর হাত ধরে মিনতি ভরা সুরে আবেগে বলে যেতে লাগলেন, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো, মিলি। এই বৃদ্ধ বয়সে আর কেলেঙ্কারী করো না, আর লোক হাসিও না। তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট, বেশ তো আছো—জীবনটা তো বেশ

সুখে কাটালে। কেন শেষ বয়সে এই হতভাগাকে দগ্ধে মারতে চাচ্ছো ... তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ—আমার গরীব সংসারে আর আগুন জ্বালিয়ো না—'

স্বামীর কথাগুলো বিষাক্ত তীরের মতো মালবিকা দেবীর মর্মে বিঁধতে লাগলো এবং তার বিষ তড়িৎবেগে তাঁর সারা দেহে যেন মিশে গেল—মালবিকা দেবী মূর্ছিত অবস্থায় স্বামীর কোলে ঢলে পড়লেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সারা সহরে ভীষণ চাঞ্চল্য পড়ে গেল। এই মফঃস্বল সহরের জীবনে এমন ঐতিহাসিক ঘটনা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। পুলিশের ছোট বড়ো সব কর্তারা অত্যন্ত তৎপর—সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে ব্যস্ত। জনসাধারণ ভীত, সন্ত্রস্ত।

ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মালবিকা মুখার্জি আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ তাঁর ড্রয়ার থেকে পেল একটি বিষের শিশি, একটি চিঠি, একটা উইলপত্র। শিশিটি শূন্য, চিঠিতে লেখা—তাঁর আত্মহত্যার জন্য তিনি নিজেই দায়ী, আর উইলে লেখা—তাঁর সমস্ত সম্পদ তিনি দিয়ে যাচ্ছেন এ বৎসরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী শ্রীমান্ তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়কে।

ক্ষুধিত মানুষ

সূর্যগড় : রাজ্য, দেশীয় রাজ্য নয়—নিছক একটা জমিদারী। কিন্তু প্রজারা বলে রাজ্য—নবাবী আমলের জেরটা আজো তাদের মুখে বিদ্যমান। আয়তন টেনেটুনে তিনশ' বর্গমাইল—সবটাই নিম্ন কৃষিভূমি : প্রজারা প্রায় নিরনব্বই জনই কৃষক-মজুর।

রাজ্যের সেরা ব্যক্তি রাজা—নবাবী আমলের মহারাজার বংশধররা ইংরেজ আমলে নেমে এসেছেন রাজায়।

রাজা বাস করেন প্রাসাদে। এক বর্গমাইল বিস্তৃত প্রাসাদ। সদর-মধ্য-অন্দর—এই তিন মহলা; প্রত্যেক মহল আবার এক দুই তিন—নানা নম্বরে বিভক্ত। প্রাসাদটীর নির্ম্মাণকাল নির্ণয় করা চোখের দেখায় শুধু অনুমান মাত্র। জনশ্রুতি, দেবাদিদেব ধর্মদেবের স্বপ্নাদেশে চৌদ্দপুরুষ পূর্ব্বের মহারাজা সূর্যানন্দ এই প্রাসাদটী নব নির্ম্মাণ করেন; আর শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিতকল্পে এর চতুর্দিকে খনন করেন সুগভীর সুবিস্তৃত পরিখা। সেই থেকেই এর নাম সূর্যগড়।

পরিখার চতুর্দিকে বিস্তৃত ঘন জঙ্গল : তার বাসিন্দা নেকড়ে, ভোঁদড়, বানর, ময়ূর, হরিণ, সাপ ইত্যাদি। তারপর আবার চওড়া পরিখা। তারপর তার চতুর্দিকে সুরু রাজ্য। রাজ্যের সঙ্গে রাজ-প্রাসাদের যোগাযোগ জলপথে—মধ্যের জঙ্গলে একাংশে প্রণালী। প্রণালীর উভয়পার্শ্বে উচ্চভূমিতে সুরক্ষিত দুটী মরিচাপড়া কামান—শতদল, সহস্রদল; বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে স্থাপিত।

রাবণের বংশের মতো সূর্যবংশের উত্তর-পুরুষে আজ প্রাসাদটী কানায় কানায় পরিপূর্ণ—ফাঁকফুকটুকু সেরেস্তাদার, গোমস্তাদার, নায়েব, মুহুরী, বিদূষক, চাটুকার, চাকর, চাকরাণীতে ভরা। বছরের পর বছর, পুরুষের পর পুরুষ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশবৃদ্ধি হতে হতে সূর্যবংশে বর্তমানে লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড়শ'।

মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রই হতেন মহারাজা। অন্যান্য সকলে ষ্টেটের একজন হয়ে কাটাতেন জীবন। তাঁদের না ছিল কোন ভাবনা, শুধু ছিল কামনা। তাঁদের অলস মস্তিষ্ক ছিল শয়তানী হাপর, ফলে প্রাসাদটী হয়ে উঠেছিল শয়তানী ষড়যন্ত্রের কর্মশালা। এর দেওয়ালে দেওয়ালে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিহিত রয়েছে শত শত বৎসরের কত গোপন কাহিনী, কত গুপ্তপ্রেম, কত অতৃপ্ত বাসনা, কত যৌন-ব্যভিচারের বীভৎসতা, কত অবিচার, কত অত্যাচার, কত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, কত হাহাকার ক্রন্দন! কিন্তু এ সবেরই মূল কাম-লালসা। এই কাম-লালসা চরিতার্থতাকে তাঁরা কেবল নিজবংশে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তা প্রসারিত করেছিলেন পরিচারিকাদের দেহ পর্যন্ত। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই প্রাসাদে জন্ম নিয়েছে শত শত জারজ-সন্তান।

রাজার আইন কঠোর—সে-আইনে পরিচারিকার গর্ভজাত-সন্তানের বাঁচবার নেই কোনো অধিকার। তাই মাতৃগর্ভ থেকে মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চলে যেতে হয় ধরিত্রীর গর্ভে। কে তার জন্মদাতা—তার হিসেব-নিকেশের নেই কোন প্রয়োজন: সবাই জানে রাজবংশের কারো-না-কারো ঔরসে তার জন্ম। 'কৌণ্ডিল্য মুনির' এই বংশে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে এই-ই—এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কাজে কাজেই এই নিয়ে ঋষির উত্তর পুরুষগণ কোন মাথা ঘামান না, ঘামাবার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

রহস্যময়ী এই সূর্যগড়ের বর্তমান রাজা প্রবল প্রতাপান্বিত চৌধুরী শ্রীশ্রীরাজা ভৈরবানন্দ রায়বাহাদুর—স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজের পিছনে থাকায় নামের পিছনে পান রায় বাহাদুর। এক রাজ্য, দুই রাণী ও তিলোত্তমাকে নিয়ে প্রজাবৎসল রাজা শান্তিতেই করছিলেন প্রজাপালন; কিন্তু সামান্যা নারী তিলোত্তমা সেই শান্তিতে ঘটালো বিঘ্ন।

সে প্রায় বাব বছর আগের কথা। পিতৃদেবেব পরলোক প্রাপ্তির পর ভৈরবানন্দ অভিষিক্ত হলেন রাজপদে। বাজা হয়ে ঘোষণা করলেন তিনি বেরোবেন রাজ্যদর্শনে। উদ্যোগপর্ব শেষ করে সুরু করলেন যাত্রা-পর্ব। নতুন রাজাকে দর্শন উপলক্ষ্যে পুণ্যালোভাতুর প্রজাবা দিল দর্শনী—বহুকষ্টে-সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যের একাংশ বিক্রী ক'রে ক'রে। অর্থের দর্শনী স্ফীত হতে হতে রাজ্য-পরিক্রমার শেষের দিকে তাঁর মিলে গেল এক জীবন্ত দর্শনী—এক পঞ্চদশী রূপসী বিধবা। জনৈকা অসহায়া বৃদ্ধা বিধবা গ্রামের শত শত লোলুপ দৃষ্টি থেকে তার এই হতভাগ্য বিধবা মেয়েকে রক্ষাকল্পে রাজপদে চাইল আশ্রয়; ফলে রাজপ্রাসাদের পরিচারিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে দুজনেই এলো রাজঅন্তঃপুরে। বছর না ফিরতেই মা গেল মারা, মেয়ে হয়ে উঠল 'মেনকা'।

এই মেয়েই সেই সামান্যা তিলোত্তমা; শুধু ভুবনমোহিনীরূপে হয়ে উঠল অসামান্যা। তার জন্য পবিখাব বাইরে গড়ে উঠল বিলাস-ব্যাসনের মর্মগৃহ—সুরম্য অট্টালিকা। তার জ্যোতির্ময়ী দেহ মোড়া হল স্বর্ণালঙ্কারে; আর সেই দেহতটে পাক খেয়ে খেয়ে আছাড় খেতে লাগল ভৈরবানন্দের যৌবন-জোয়ার। দুই রাণীর বিনিদ্র রজনীর হাহাকার নিঃশ্বাস যখন অন্তঃপুরের বাতাসকে তুলতো বিষিয়ে, তখন মদের মধুর গন্ধ তিলোত্তমার কক্ষের বাতাসকে করে তুলতো মদির।

এমনিভাবে চলে যায় দিন ...

কালক্রমে তিলোত্তমা হল অন্তঃসত্ত্বা। সে দেহে ও মনে অনুভব করল এক নব জাগরণ, এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য। তার দেহের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে, প্রতি রক্তকণায় সজীব হয়ে উঠল সেই আদিম জননীর প্রথম মাতৃত্ব। তার মনে দেখা দেয় কখনও বা আনন্দের বিহ্বলতা, কখনও বা শঙ্কার দুর্বলতা ; কখনও বা দোলা দেয় কত আশা, কখনও বা উঁকি মারে কত নিরাশা। রাজার কাছে গোপন রাখে সে নিজের মাতৃত্বের কথা ; কিন্তু কালক্রমে একদিন রাত্রে হয়ে পড়ল তা প্রকাশ। ভৈরবানন্দের জৈবিক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে তিলোত্তমা তাঁর হাত ধরে করলো করুন আবেদন—আপনার কাছে আমার ভিক্ষা —আমার ভাবী সন্তানের প্রাণভিক্ষা দিন, দূরে কোথাও গোপনে রাখুন কিংবা কাউকে দিয়ে দিন, শুধু প্রাণে মারবেন না। কথাটা তাঁর কানের একান্ত কাছে হলেও এ মুহূর্তে কথা বলার অবস্থা নয় ভৈরবানন্দের। তাছাড়া এমন একটা নগণ্য তুচ্ছ কথাকে তিনি কানে দিলেন না এতোটুকু আমল ; স্রেফ দিলেন হেসে উড়িয়ে।

তিলোত্তমার প্রথম সন্তানকে চলে যেতে হল তার পূর্বগামী শত শত জারজ সন্তানদের আশ্রয়ে।

তিলোত্তমা পেল গভীর আঘাত, পড়ল ভয়ানক মুষড়ে। বিধাতার প্রথম দানকে বিনা অপরাধে এমনিকবে শাস্তি পেতে হল—তার বিক্ষুব্ধ মাতৃহৃদয় পায় না এতটুকু সান্ত্বনা। রাজা যদি তাকে এতোই ভালবাসেন তবে কেন তার সন্তানকে দিলেন না শুধু বাঁচবার অধিকার!

দিন চলে যায় ···

পুনর্বার তিলোত্তমা হল অন্তর্বত্নী। শঙ্কায় কেঁপে ওঠে তার পীড়িত মাতৃহৃদয়। যেমন করে হোক এ সন্তানকে হবে বাঁচাতে। সে উপায় অনুসন্ধান করে। উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে

যায়, শিরায় রক্ত দ্রুতবেগে বইতে থাকে; মনে হয়, সে যেন পাগল হয়ে যাবে। অবশেষে পথের একটা নিশানা এলো তার মাথায়।

তিলোত্তমার রূপলাবণ্যের কথা শুধু যে এই রাজ্যেই পরিব্যাপ্ত, তা নয়; পার্শ্ববর্তী জমিদারীগুলিতেও তা ছড়িয়ে পড়েছে রূপকথার মতো। এই রূপকথা গিয়ে পড়ছিল দেবগড় রাজষ্টেটের তরুণ জমিদার কুমার মৃগেন্দ্রনারায়ণ দেবের কানেও। তিনি গুপ্তচরের সাহায্যে এর যাথার্থ যাচাই করলেন। তারপর গোপন ষড়যন্ত্র করলেন তিলোত্তমাকে আপন প্রাসাদে সরিয়ে ফেলবার। কিন্তু তিলোত্তমা হল গররাজি। কারণ, যিনি তাকে দিয়েছেন আশ্রয়, দিয়েছেন রাণীর সৌভাগ্য; তাঁকে সে করতে পারল না পরিত্যাগ। অন্তঃপুরের পরিচারিকাদের অবস্থা তার চোখে দেখা; তাদের সঙ্গে তার চলে না কোনও তুলনা, এমন কি সে যে সেই অন্দরবাসিনী রাণীদের চেয়েও অনেকাংশে সৌভাগ্যশালিনী।

কিন্তু আজ তার ভাঙল ভুল। সে বুঝতে পারল, সে শুধু রাজার কাম-লালসা পরিতৃপ্তির আধার মাত্র। তাঁর আর পাঁচটা প্রয়োজনীয় ব্যবহার্যের মতো সেও তাঁর প্রয়োজনীয়; তাই তিনি তাদের মতো তাকে রাখছেন গুছিয়ে। সে আরো বুঝতে পারল অন্তঃপুরের পরিচারিকাদের ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত। নইলে সর্ববিধ রাজসুখের মধ্যে রাখা সত্ত্বেও তার পেটের সন্তানকে মেরে ফেলা হয়! এ রাজসুখের চেয়ে দীনতম ভিখারিণীর জীবনও ঢের সুখের— সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবার থাকে তার পুরো অধিকার। এ রাজসুখ থেকে সে হতে চাইল মুক্ত। মুক্তির উপায় শুধু পলায়ন; কিন্তু পৃথিবীতে নেই তার সামান্যতম আশ্রয়। তাই পূর্ব ভুলের ক্ষমা চেয়ে সে কুমার মৃগেন্দ্রনারায়ণের কাছে গোপনে পাঠাল সংবাদ—সে তাঁর কাছে চলে যেতে চায়।

কুমার মৃগেন্দ্রনারায়ণ তিলোত্তমাকে কোনদিন দেখেননি নিজের চোখে। তার রূপলাবণ্য কতখানি, তা একবার তাঁর নিজের চোখে দেখা প্রয়োজন; তারপর তাকে আনয়ন। তাকে চোখে দেখতে হলে আপাততঃ চাই তার কাছে যাওয়া; কিন্তু তার দুর্গম দুর্গে যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। তাই তার সুযোগ সন্ধানে তিনি রত হলেন।

সুযোগ তাঁর হাতে এল কিছুদিনের মধ্যেই। ভৈরবানন্দ হয়ে পড়লেন অসুস্থ: তিলোত্তমার কাছে তাঁর যাওয়া হল বন্ধ। এ খবর পেলেন মৃগেন্দ্রনারায়ণ। সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি গা ঢাকা দিয়ে এলেন তিলোত্তমার প্রাসাদে। তিলোত্তমার নয়ন-বিমোহন রূপ দেখে তিনি হলেন মুগ্ধ—এমন অপরূপ রূপসী তিনি কখনও দেখেন নি জীবনে। তাঁর মনের মধ্যে সৃষ্ট হল মায়াজাল, চিত্তে উন্মেষ হতে সুরু হল কামনার অঙ্কুর।

তিলোত্তমা বলে যায় এই রাজবাড়ীর কত লোমহর্ষক কাহিনী, কত রোমাঞ্চকর ঘটনা: অপরাধীকে জীবন্ত পোড়ানো, জীবন্ত মানুষকে অর্ধেক পুঁতে বাঘ দ্বারা খাওয়ানো—তার শোনা এমনি সব কাহিনী। সে আরো বলে যায় শত শত জারজ-সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলার করুণ কাহিনী, তার নিজের চোখে দেখা দু'চারটে ঘটনাও। সে বলে যায় তার বুক থেকে তার সন্তানকে জোর করে কেড়ে নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলার মর্মন্তুদ কাহিনী—তার দুচোখ বেয়ে নেমে আসে শ্রাবণের ধারা।

মৃগেন্দ্রনারায়ণ অভিভূত হয়ে শুনছিলেন এইসব কাহিনী। তিনি পূর্বে শুনেছিলেন এঁদের নির্মমতার দু'একটা কথা। নিষ্পাপ শিশুকেও অসঙ্কোচে মাটীতে পুঁতে ফেলতে পারে—এঁরা যে এতোবড়ো হৃদয়হীন বর্বর—একথা অক্সফোর্ডের ডিগ্রীপ্রাপ্ত মৃগেন্দ্রনারায়ণ ভাবতেও পারেন না। মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ভাবছিলেন অনেকদিন

পরের কথা—পুরুষানুক্রমিক এঁরা শত শত শিশুকে মাটীতে প্রোথিত করে যে-মহাপাপ করে আসছেন সে-মহাপাপই হয়তো নিযুত বছর পরে এই সূর্যগড়কে নীত করবে এক ঐতিহাসিক চরম সৌভাগ্যের স্বর্ণদ্বারে …

… সেদিনের পৃথিবীর প্রবুদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকদের মাথা চিন্তার ভারে নুয়ে পড়বে : সেদিন তাঁদের কানে পৌঁছবে না এই এক ঘণ্টা আয়ুষ্মান শত শত শিশুর প্রথম ক্রন্দন, সেদিন তাঁদের হাতে লাগবে না এদের তপ্তরক্তের উত্তাপ ; শুধু এদের নরম অপরিণত অস্থি ফসিলরূপে তাঁদের কাছে বহন করে নিয়ে যাবে এক মহাসত্য—পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল সূর্যগড়েই … যাদের দেহ ছিল অপূর্ণ, মাথা ছিল মস্তিষ্কহীন ; যাদের ছিল না মন, হৃদয় ছিল না কঠিন ; যারা জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির আবির্ভাবের প্রথম স্তরে শুধু এক্সপেরিমেণ্টরূপে প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্ট—'ফ্রেক অব্ নেচার' …

'আপনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমার ছেলেকে মারবেন না তো ?' পুরুষ মানুষের প্রতি তার স্বাভাবিক সন্দিগ্ধ অথচ করুণ অসহায় দৃষ্টি দিয়ে তিলোত্তমা চোখ মুছে তাকাল মৃগেন্দ্রনারায়ণের মুখের দিকে।

ছিন্ন হল মৃগেন্দ্রনারায়ণের চিন্তাসূত্র। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে তাকে বললেন, 'তোমার এ ছেলেকেও মারবো না, পরে যদি আরো জন্মায়, তাকেও না। আমি ওদের সব কলকাতায় অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেব। অনাথ-আশ্রমে এমনি সব অবাঞ্ছিত ছেলেমেয়েদের পালন করা হয়, তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা হয়।'

বিস্মিত হল তিলোত্তমা। পরের ছেলেকে কেউ বিনে পয়সায় খাইয়ে-দাইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেয়—এমন কথা সে কখনও শোনেনি। যদি বা এরকম কিছু থাকে, ইনি কী সত্যিই

তার ছেলেকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন—এতো ভালো কথা সে পারছে না বিশ্বাস করতে।

মৃগেন্দ্রনারায়ণ বুঝতে পারলেন তিলোত্তমার দ্বিধাচিত্ত মনের কথা। তার সন্দেহ দূর করবার জন্য তিনি বললেন, 'আমার কথা বুঝি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি এক কথার মানুষ, কথার আমার নড়চড় হয় না, পরে বুঝতে পারবে। অনাথ-আশ্রমে তোমার ছেলেকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব।'

'আপনি কত বড় মহৎ, কত বড় দয়ালু, আপনি আমার দেবতা,' বলে সে হঠাৎ জড়িয়ে ধরলো মৃগেন্দ্রনারায়ণের পা দুটো।

'আ! কী করছো! এখন ওঠ, খাবার ব্যবস্থা করতে হবে,' বলে তিনি তার হাত দুটো নিজের পা থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। তিলোত্তমা উঠে বসল। আলোচনায় ঠিক হল—যথাসম্ভব গোপনতায় আগামীকাল রাত্রে দেবগড় রাজপ্রাসাদে হবে তিলোত্তমার পলায়ন। আর আজকের রাত্রিটা মৃগেন্দ্রনারায়ণের কাটবে এখানে; কিন্তু প্রত্যুষের পূর্বেই তাঁকে করতে হবে এস্থান ত্যাগ।

তিলোত্তমার অসান্নিধ্যে ভৈরবানন্দের দেহ-মন করছিল ছট্‌ফট। আজকে শরীর কিছু সুস্থ হওয়ায় রাত্রির আহার সেরে তিনি চাপলেন নৌকায়।

তিলোত্তমার পালঙ্কে শায়িত মৃগেন্দ্রনারায়ণকে দেখে তিনি বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন; যেন স্বপ্ন দেখছেন—প্রথমটা তাঁর তাই মনে হল।

হঠাৎ সামনে বাঘ পৌঁছলে মানুষের অন্তরাত্মা যেমন যায় শুকিয়ে তিলোত্তমার অবস্থা হল তাই। সম্পূর্ণ সেরে না-ওঠবার আগেই যে রাজা আসবেন তার কাছে—একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার মাথা লাগল ঘুরতে, জিহ্বা গেল শুকিয়ে; তার গলা দিয়ে

বেরোলোনা কোন কথা। সে শুধু কক্ষটার এক কোণে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল।

বিস্ময় কাটিয়ে ভৈরবানন্দ উপলব্ধি করতে পারলেন বাস্তবতা। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন পালঙ্কের কাছে। মদের গন্ধ গেল তাঁর নাকে। তিনি বুঝতে পারলেন মৃগেন্দ্রনারায়ণ নেশার ঘুমে ঘুমন্ত। তারপর তিনি ক্রুর দৃষ্টিতে তাকালেন তিলোত্তমার দিকে। যদি সত্যযুগ হত তাহলে এই দৃষ্টির আগমনে তিলোত্তমা এতক্ষণে হয়ে যেত ভস্ম! নেহাৎ কলিযুগ বলে এযাত্রা সে প্রাণে বেঁচে গেল।

ভৈরবানন্দ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর ও কর্কশ করে বললেন, 'এ এখানে কেন?'

'আমি জানি না—কিচ্ছু জানি না—কিচ্ছু জানি না,' বলতে চাইল তিলোত্তমা; কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরোলো না এতোটুকু টুঁ শব্দ; বরং আরো বেশী জোরে লাগল কাঁপতে।

'হুঁ, বুঝেছি,' বলে ভৈরবানন্দ বেরিয়ে গিয়ে দরজায় দিলেন শিকল। অন্ধকার বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবতে থাকেন: মৃগেন্দ্রনারায়ণের হেথায় আগমন—এ অসম্ভব কী করে হল? তিলোত্তমার ডাকে, না নিজের কামনার তাড়নায়? যদি মৃগেন্দ্রনারায়ণ জোর করে এখানে আসত নিশ্চয়ই তিলোত্তমা তাঁকে সংবাদ পাঠাত। না, বিদ্বান মৃগেন্দ্রনারায়ণের স্বেচ্ছায় ঘটেনি এ আগমন, এর পশ্চাতে রয়েছে তিলোত্তমার ডাকও। এ আগমন শুধু আজ, না পুরাতন ··· তিনি ভেবে আশ্চর্য হন যে-তিলোত্তমার জীবন কাটত পথ-কুকুরের মতো, একমাত্র তাঁরই দয়ায় যে আজ সে রাজরাণী—একথা ও কী ভুলে গেল! আশ্চর্য এই নারী-মন!—তাঁর মুখ ক্রমে কঠিন হয়ে উঠল। কী যেন ভেবে নিয়ে তিনি উঠানে নামলেন। তারপর সোজা পথ ধরে সিংহদ্বার অতিক্রম করলেন।

গড়ের দিকে না-গিয়ে তিনি চলতে লাগলেন পশ্চিম দিকের পথে। কয়েক শ' গজ গিয়ে দাঁড়ালেন খড়-ছাউনী একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে। বাড়ীর মালিকের উদ্দেশ্যে দিলেন ডাক, 'জব্বর ...'

জব্বরের ঘুম গেল ভেঙ্গে। কণ্ঠস্বরে সে বুঝতে পারল ব্যক্তিটিকে। ধড়ফড় করে উঠে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। লণ্ঠন রেখে সে ভৈরবানন্দকে আভূমি সেলাম ঠুকলো।

'মাসুম ঘরে আছে ?'

'হ্যাঁ, হুজুর,'

'তাকেও ডাক,'

ভয়ে জব্বরের সর্বাঙ্গে দেখা দিল ঘাম। ষোল বছর বয়েস থেকে আজ এই ছত্রিশ বছর সে পিয়াদাগিরি করে আসছে, কিন্তু কখনও সে এমন কাজ করেনি যার জন্য কোনো হুজুর তাকে করেছে এতোটুকু সন্দেহ। আজ তারা এমন কী করল যার জন্য হুজুর চাকর না-পাঠিয়ে এতোরাত্রে স্বয়ং এসেছেন তার বাড়ীতে! তার সুদীর্ঘ পিয়াদাগিরি-জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও। রাজদণ্ড যে কী কঠোর—তা তার জানা; তাই সংশয় ও সভয়ে পুত্রকে নিয়ে সে ভৈরবানন্দের সামনে এসে দাঁড়াল।

'তোর বাপ-বেটাকে এখনই একটা কঠিন কাজ করতে হবে।' ফিস্‌ফিসিয়ে আদেশ করলেন ভৈরবানন্দ। জব্বরের পিতা-পুত্রের সংশয় গেল কেটে; কিন্তু বিস্ময় গেল বেড়ে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেও তারা দেখতে পেল হুজুরের কঠিন মুখ ও বাঘের চোখের মতো জলজ্বলে দুটো চোখ।

'হুজুরের যে কোন হুকুম কী আমরা তালিম করিনি।' বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দেয় জব্বর।

'তা জানি, আমার বাপ-ঠাকুর্দা তোর বাপ-ঠাকুর্দার উপর চিরকাল

বিশ্বাস করেছিলেন; তারাও তা রেখেছিল। আমি জানি, তোরাও আমার আদেশ মানবি।'

'হুজুরের কী হুকুম, আজ্ঞা হয়—' বলে জব্বর সেলাম ঠুকলো।

ভৈরবানন্দ তাদের একান্ত কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে কী বললেন।

ভূত দেখলে মানুষ যেমন আঁৎকে ওঠে, তেমনি তারা আঁৎকে হাত তিনেক পিছিয়ে গেল। তারপর পিতাপুত্র পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে হুজুরের দিকে ফিরে তাকাল।

'জব্বর, তুই লোকটাকে শীগগীর নৌকায় নিয়ে আয়; মাসুম, তোকে যা বললাম, তা এক্ষুণি করিস্‌। যেমন বললাম, ঠিক তেমনিভাবে'—বলে ভৈরবানন্দ একতাড়া নোট জব্বরের হাতে গুঁজে দিলেন। 'দু'শো টাকা আছে, রেখে দে; কিন্তু খুব সাবধান! কেউ যেন টের না পায়, মনে রাখিস, প্রকাশ পেলে তোদের আমি সবংশে কবরে পাঠাবো'—বলে তিনি গড়ের মুখে পা বাড়ালেন।

এদিকে জব্বর ঘরে ঢুকে লণ্ঠনের আলোয় টাকাগুলোকে বার বার দেখতে লাগলো। চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করে টাকা গণতে আরম্ভ করলো, গোনার শেষে একটা কাঠের বাক্সে টাকাগুলো রেখে ভালো করে চাবি লাগালো। এক সংগে এতগুলো টাকা সে জীবনে কখনও পায়নি। প্রভুভক্তি তার ভয়ানক চাঁড়া দিয়ে উঠলো। হুজুরের হুকুমে সে পাতালপুরীর রাক্ষসদের বধ করে রাজকন্যাকে আনতে পারে। উত্তেজনায় সে আপাততঃ দুটো চটের থলে, এক গোছা নারকেল দড়ি ও একটা রামদা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখলে মাসুম নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। 'এই নে' বলে সে রামদাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

'বাপজান, একাজ আমি পারব না।'

'হ্যাঁ!' পুত্রের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ভয়ে চমকে উঠল জব্বর। সে এদিক-ওদিক তাকালো। না, কেউ কোথাও নেই ; হুজুরও এতোক্ষণে নৌকায় পৌঁচেছেন। নরম সুরে বললো, 'কেন পারবি নি।'

'যাকে মা বলি তাকে মারতে পারবনি।'

'কিন্তু যার নিমক খেয়ে বেঁচে আছি, তার হুকুম ত পালন করতে হবে।'

'তাই বলে বাইজীকে হত্যা করে থলিতে পুরে নদীতে ফ্যালা … 'না … না … না … আমি কিছুতেই পারব নি।'

'বেশ, আমি করব …'

'না, তোমাকেও তা করতে দিবনি।'

পুত্রের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে জব্বর ঘাবড়ে গেল। তবু স্বপক্ষে যুক্তি দেখায়, 'হুজুর যে দু'শ' টাকা দিয়াছেন।'

'কেন, মাইজী কী কিছু দেয়নি ? পূজা-পার্বণ-উৎসবে নতুন জামা-কাপড়, অভাব-অভিযোগে টাকা-পয়সা ?'

'তাহলে যে আমাদের সবাইকে মরতে হবে।' একেবারে অসহায়ের মতো বলে যায় জব্বর।

'না, আমি একটা উপায় ঠিক কচ্ছি ; আমি মাইজীকে জামাল মেসোর সাঙ্গাত গদাধরের ঘরে রেখে আসব।'

'অতদূর এখন যাবি কী করে ?'

'যেমন করে হোক যাব আর ভোরেই ফিরব। আমি মাইজীকে নিয়ে এখনি বেরি পড়ি ; আর তুমি হুজুর যেমন বলছেন লোকটাকে দড়ি দিয়া বেশ করে বেঁধে থলায় পুরে বস্তা করে নিয়ে যাও। শয়তান, মাইজীর কাছে আসছে বদমাসী করতে, তার ফলভোগ করুক।'

'বেশ, তাড়াতাড়ি চল, দেরী হয়ে গেল, হুজুর নৌকায় বসে আছেন।'

'চল।'

দিন কয়েকের মধ্যে চতুর্দিকে সুরু হোল একটা চাপা কানা-ঘুষা। কিন্তু কেউ করল না কোন প্রকাশ্য আলোচনা। সবাই সিদ্ধান্ত করল নিশ্চয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে তিলোত্তমা করেছে পলায়ন। কিন্তু কে সে? কেনই বা এ রাজরাণীর ভাগ্য ছেড়ে পালাল? গেলই বা কেমন করে? ভেবে আশ্চর্য হয় তারা! কিন্তু জব্বর-মাসুম জানে— দেবগড় রাজ্যের কোনো নিভৃত গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে অতি সন্তর্পণে তিলোত্তমা কাটাচ্ছে জীবন। আর ভৈরবানন্দ জানেন— তিলোত্তমার যে-দেহ তাঁকে করেছিল উন্মত্ত, এতোদিনে সে-দেহ হয়েছে কোন কুমীরের উদরাসাৎ।

ঠিকই হয়েছে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য—ভাবেন সর্বশক্তিমান চৌধুরী শ্রীশ্রীরাজা ভৈরবানন্দ রায় বাহাদুর। নিশ্চিন্ত চিত্তে তিনি লক্ষ্য দিলেন রাজকার্যে, মন দিলেন রাণীদের প্রতি। এতোদিন পরে তিনি হঠাৎ উপলব্ধি করলেন রাণীদের প্রতি তাঁর অবহেলা আর তিলোত্তমার প্রতি তাঁর এতো আকর্ষণ—তাঁর পক্ষে এটা অত্যন্ত অনৌচিত্য ব্যাপার। অন্তরে তাঁর উপজিল সরম। তাই বহির্মুখী চিত্তকে করতে চাইলেন অন্তর্মুখী। ফলে অন্দরমহলে বেড়ে গেল তাঁর যাতায়াত। কিন্তু দেহের রাজসময় যে-যৌবন যথেচ্ছ অপচয়ে সেটা তাঁর কেটে গেছে তিলোত্তমার সান্নিধ্যে; সুতরাং ভাঁটা-যৌবনকে উজান-মুখো করতে হলেন তিনি যত্নবান; কিন্তু আজ তার গতি ফিরানো হল তাঁর সাধ্যাতীত।

তথাপি রাণীরা হলেন সুখী। রাজার শুধু মন পাওয়ায় তাঁরা হলেন ধন্য, হলেন মহাখুসী। যদিও তাঁদের ভাগ্যাকাশের রাহু তিলোত্তমার অশরীরী অবস্থিতি তাঁদের ও রাজার মধ্যে করে রইল এক অদৃশ্য ব্যবধান।

দিন চলে যায় ···

বছর কয়েক পরে রাজার প্রথম সন্তান ছোটরাণীর গর্ভজাত মাধবী পনের বছর বয়সে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে ফিরে এলো বাপের বাড়ী। কিছুদিন পরে বড় রাণীর গর্ভজাত দেবানন্দের সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেখা দিল গলিত ক্ষত। দেশী-বিদেশী বহু ডাক্তারের বহু ওষুধ ব্যর্থ করে বছর খানিক ভুগে তের বছর বয়সে সে মায়া কাটাল এই ধরণীর। একমাত্র কন্যার বৈধব্যকেও সহ্য করতে পেরেছিলেন—কিন্তু একমাত্র পুত্রের মৃত্যুকে ভৈরবানন্দ পারলেন না সহ্য করতে। তিনি পড়লেন ভয়ানক মুষড়ে। আপন ভাগ্য-বিপর্যয়ের ও রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে তিনি ক্রমে যেতে লাগলেন শুকিয়ে। অবশেষে তিনিও একদিন হার্টফেল করে পরলোকে দিলেন পাড়ি।

রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিন। আলুলায়িতা কেশে, বিশ্রস্ত বসনে শোকাকুলা বড় রাণী আপন কক্ষের মেঝেতে উপবেশিত। তাঁর পাণ্ডুর মুখ পনের দিনেই তাঁর বয়সকে বাড়িয়ে দিয়েছে পনের বছর। চোখে তাঁর বর্ষার অবিরল ধারা। নিজের অবসন্ন চেতনাহীন দেহটাকে দেওয়ালে এলিয়ে দিয়ে তিনি নীরবে কাঁদছিলেন আর ভাবছিলেন নিজের চরমতম ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা •••

তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর কাছে বসেছিল একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা, হাতে তার পাখা। মাঝে মাঝে রাণীকে দিচ্ছিল বাতাস। প্রাসাদের অধিকাংশ চাকর-চাকরাণী, কর্মচারী ও অন্যান্য লোকজন সব চলে গেছে গড়ের বাইরে কাঙালী-ভোজন পরিচালন-ব্যাপারে। কাঙালী-ভোজন চলছিল তিলোত্তমার প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে। দূর-দূরাগত গ্রাম থেকে এসেছে দলে দলে কাঙালী। তাদের সংখ্যাস্ফীতির কারণ পেটের জ্বালা আর রাজ-শ্রাদ্ধ ভোজনে পুণ্যলাভ।

ঐ বৃদ্ধা পরিচারিকা বাতাস দিতে দিতে হঠাৎ শিউরে চমকে উঠল। তারপর বড় রাণীকে বললো, 'বড় রাণী মা, কাল ভীড়ে একটা

কাজ করতে ভুলে গ্যাছি। বুড়ি হ'ছি, পোড়া মনে যদি কিছু মনে থাকে।'

বড় রাণী তার দিকে তাকালেন শুধু, কিন্তু কোন কথা বল্লেন না।

পরিচারিকা কিন্তু কিন্তু করে বললো, 'রাজাবাবুর ভালুককে কাল খেতে দিইনি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে বড় রাণী শুধু তার দিকে চেয়ে রইলেন।

'যাই রাণী মা, খাবার দিয়া এখ্‌নি ফিরে আসব।'

'রাজাবাবুর ভালুক!' বড় রাণী কথা কইলেন।

'হ্যাঁ, রাণী মা, তুমি কী জান নি? রাজাবাবুর পোষা ভালুক।'

'পোষা ভালুক! কোথায়?'

পরিচারিকা রাণীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল মধ্য-মহলের পশ্চিম-ভাগের সবচেয়ে নির্জন অংশে। মধ্য-মহলটা রাজাদের জন্য নির্দিষ্ট; যেমন সদর মহল চাকর-বাকর, সেরেস্তাদার-গোমস্তাদার, অতিথি-অভ্যাগতদের আর অন্দরমহল রাণীদের ও রাজবাড়ীর অন্যান্য রমণীদের জন্য। মধ্য-মহলেই দরবার-হল, বিচারশালা, শাস্তিশালা। শাস্তি-শালাগুলি সবার পশ্চিমে এবং বিচারশালার পরেই; কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে। এই অংশে যাতায়াত নিষিদ্ধ; তাই একান্ত নির্জন। রাজপ্রাসাদের এই অংশটাই সব চাইতে রহস্যময়ী এবং ভয়াবহ।

এদিক-ওদিক, এপাশ-ওপাশ ঘুরে, এঘর-ওঘর অতিক্রম করে অবশেষে পরিচারিকা রাণীকে নিয়ে উপস্থিত হল একটা ছোট দরজার সামনে। দরজার তালা খুলে পরিচারিকা রাণীকে নিয়ে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল। প্রকোষ্ঠটাও বেশ ক্ষুদ্র। পনের-ষোল ফুট উঁচুতে সামনের দেওয়ালের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেখিয়ে পরিচারিকা রাণীকে বললো, 'ঐখানে ভালুক আছে।'

বড় রাণী কিছুই বুঝতে পারলেন না। শুধু দেখলেন প্রায়

দুই বর্গফুট পরিমিত স্থানের চতুর্দিক কাটা—যেন একটা পৃথক পাথর খুব সাবধানে বসানো ; অথচ সহজবোধ্য নয়। আর দেখলেন একটা মই মেঝে থেকে সেখান পর্যন্ত সংলগ্ন।

দেওয়ালে পোষা ভালুকের বাসা—রাণীর সন্দেহ হয়, 'ঐখানে ভালুক আছে!'

'হ্যাঁ, রাণী মা, ঐ চারকোনা জিনিষটা কাঠ,' খিলানের আংটাটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বললো, 'ঐ আংটা ধরে টানলে ওটা বেরিয়ে আসে, ওর ভিতর একটা কপাট আছে, সেটা খুললেই ভিতরে আবার ঘর আছে, সেই ঘরে রাজাবাবুর ভালুক আছে।'

বড় রাণী কথাটা বিশ্বাস করতে না-পারলেও অবিশ্বাসও করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন এর মধ্যে যেন কোন রহস্য নিহিত রয়েছে, 'তুই জানিস্, এর মধ্যে ভালুক আছে?'

'হ্যাঁ, রাণী মা, অনেকদিন আগে রাজাবাবু মোকে এঘরে এনে বলল, আমি একটা ভালুক পুষছি, তুই দিন ভাত দিবি, তোকে দিন চার আনা পয়সা দিব। আর বলল, কাউকে বলিসনি ; তাই আমি কাউকে বলিনি। হ্যাঁ, রাণীমা, রাজাবাবু তোমাকেও ভালুকটা দেখায় নি। ভালুকটা ত খুব ভাল ; কখনও মোকে কামড়ায় নি। রাজাবাবু বলেছিল, ভালুকটা কামড়াতে জানে নি।'

এই বৃদ্ধা বোকা সরল পরিচারিকার এইসব কথা শুনে বড় রাণীর বিস্ময় ও কৌতূহল দুই-ই বেড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালুককে কেমন করে খেতে দিস?'

ঐ কক্ষের এককোণ থেকে শিকার মতো অনেকটা লম্বা দড়ি-বাঁধা একটা বড় এল্যুমিনিয়ম ডিস ও দড়ি-বাঁধা এল্যুমিনিয়ম ঘটী এনে পরিচারিকা রাণীকে বুঝিয়ে দিল—সে কেমন করে ডিসে ভাত-তরকারি

আর ঘটীতে জল ভরে ঐখানে ওঠে কপাট খুলে সেগুলো নামিয়ে দেয় আর আগের দিনের থালা-ঘটী কেমন করে তুলে নেয়।

বিস্ময়ের সঙ্গে বড় রাণীর মনে ভয়ের সঞ্চার হল; 'তুই কী কখনও আলো নিয়ে দেখিস্ নি ভালুকটা কেমন?'

'না, রাণী-মা, রাজাবাবু আলো নিয়ে যেতে বারণ করেছিল। রাজাবাবু ঐখানে উঠে মোকে সব শিখি দিছল।'

'আচ্ছা, ভালুকটার ফোঁস ফোঁস বা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পাস্‌নি?'

'আগে আগে গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেতাম। তখন মোর ভয় করত। তারপর আর সে শব্দ শুনতে পাইনি।'

বড় রাণীর বিস্ময় ও ভয় দুই-ই চরমে উঠল। তিনি কাঠ হয়ে গেলেন। প্রাণীটার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে তাঁর হল যথেষ্ট সন্দেহ। রাজবাড়ীর কত রোমাঞ্চকর, কত অলৌকিক কাহিনী তাঁর শোনা— এটী সেইরকম কোন ঘটনা কী না কে জানে ···

তিনি পরিচারিকাকে ডেকে নিয়ে ফিরে গেলেন আপন কক্ষে। ঐ পরিচারিকার হাতে চিঠি দিয়ে ম্যানেজারকে লিখে পাঠালেন, তিনি যেন দু' চারজন লোক নিয়ে শীঘ্র গড়ে আসেন।

বড় রাণীর কাছে ঐ কাহিনী শুনে সবচেয়ে সাহসী চাকরটী মই বেয়ে উপরে উঠল। খিলানটা সরাতে দেখা গেল বেশ খানিকটা জায়গা—দু' চারজন বসবার মতো। আরো জনতিনেক সেখানে উঠে গেল। কপাটটা খুলতে একটা বিশ্রী গন্ধ তাদের নাকে গেল। কক্ষটী ভীষণ অন্ধকার। উত্তর দিকের দেওয়ালের স্কাই-লাইটের মতো ছোট ছিদ্রটীর আলো ঘরের অন্ধকারকে যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। টর্চ টিপে তারা দেখল ঠিক নীচে কী একটা জন্তু রয়েছে, আলো পেয়ে সেটা নড়ে উঠল। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখল সেটা ভালুক নয়, অস্থি-চর্মসার একটা মানুষ। মইটা টেনে তারা ভিতরে

লাগাল ও তারপর অতি সাবধানে ঘর থেকে 'লোকটাকে বাইরে নিয়ে এল।

অত্যন্ত অপরিষ্কার উলঙ্গ একটা মানুষ—অস্থিচর্মসার, হাড়ের ওপর লেপটানো শুধু চামড়া; জটা চুল, বরা নখ, পৈশাচিক মুখ-মণ্ডল, বহুদিন ইঁট-চাপানো ঘাসের মত গায়ের রং সাদা ফ্যাকাসে—অর্থাৎ এক ভয়ানক বীভৎস আকৃতি। এই বিকৃত আকৃতি দেখে আসল মানুষটাকে কিছুতেই চিনবার জো নেই; কিন্তু তার দেহের দীর্ঘ ও মোটা অস্থিগুলি এককালের এক বলিষ্ঠ ও উন্নত চেহারার নিদর্শন।

পৃথিবীর আলোয় সে দেখতে পেল অনেক মানুষকে; কিন্তু তা ক্ষণিক। বহুদিন অন্ধকারে নির্বাসিত থাকায় সে সহ্য করতে পারলো না এই ধরণীর আলো। চোখ দু'টো বন্ধ করে হাতের চেটো দিয়ে তা ঢেকে দিল। তাঁর ঠোঁট দু'টো থেকে থেকে শুধু নড়তে লাগলো। সে যেন কী বলতে চায়; কিন্তু কিছুতেই পারছে না বলতে। মুখ দিয়ে ফুটছে না তার রা ···

হৈ চৈ হুলুস্থূল পড়ে গেল ···

তারা নানারকম কথা বলাবলি করতে লাগল। কে এই লোকটা? কী অপরাধে এই শাস্তি? ক'দ্দিন এই শাস্তি ভোগ করছে? কী পাপের প্রায়শ্চিত্ত? পূর্বজন্মাকৃত কোন পাপ ··· মানুষের প্রেতাত্মার প্রতি তারা বিশ্বাসী, শুনেছে তার আকৃতির বর্ণনা; কিন্তু চোখে দেখেনি কখনও। আজ তারা তা চোখে দেখতে পেল। এই মানুষটাকে তাদের মনে হ'ল সেই প্রেতলোকের জীব ···

এই অলৌকিক মানুষের কাহিনী গড়ের বাইরেও ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। কাঙালী-ভোজনে কর্মনিরত ব্যক্তিগণ দলে দলে গড়ে এলো; এলো আরো অনেকে। এলো জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান। ভগ্ন

স্বাস্থ্য, জীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর মুখ, কোটরগত চোক্ষু, ক্লিষ্ট কালো মুখমণ্ডল, ধূসর কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু—সব মিলে তাকে দেখাচ্ছিল বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত; যেন শুধু এই মানুষটাকে দেখবার জন্য কায়ক্লেশে আজো এই পৃথিবীর বুকে বর্তমান। কিন্তু তার দেহের মোটা মোটা অস্থি এখনো প্রমাণ দিচ্ছে একদিন এ চেহারা ছিল যমদূতের। সে দাঁড়িয়ে একমনে দেখছিল এই অদ্ভুত মানুষটাকে আর দেখছিল তার কম্পিত হস্তপদ ও স্পন্দিত ওষ্ঠাধর ···

তারপর হঠাৎ এক সময়ে থেমে গেল ঐ লোকটার হাত-পায়ের কম্পান ও ওষ্ঠাধরের স্পন্দন ···

আবার একটু হৈ চৈ পড়ে গেল ···

দর্শকরা সব একে একে সরে পড়ল ···

কিন্তু শুধু ঐ বৃদ্ধ মুসলমান নিশ্চল পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। তার শুভ্র শ্মশ্রু দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ভুজগ-গমনে অশ্রু ··· সে ভাবছিল বছর দশেক আগের এক রাত্রির কথা ···

'জব্বর মিঞা, তুমি কাঁদছ কেন? এ কে?'

ঐ বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে একটী নারী-কণ্ঠের কাতরোক্তি ধ্বনিত হল।

'কে তুমি?'

'চিনতে পারনি? পারবেই বা কী করে।'

'য়্যাঁ! আপনি! এমন হয়ে গ্যাছেন! কী কুচ্ছিৎ চেহারা হয়েছে। য়্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন? আজই বা এখানে কেন?'

'কোথায় ছিলাম, সেকথা থাক। এখানে এসেছি রাজার শ্রাদ্ধে কাঙালী-ভোজনে খেতে। এই লোকটার কথা শুনে দেখতে এসেছি। একে চেনো নাকি?'

'একে আপনিও চেনেন, মা। আপনার কাছে আসার জন্য এর এই শাস্তি। আপনার মৃত্যুদণ্ড থেকে যে মানুষ আপনাকে

বাঁচিয়েছিল, সে আজ নাই; কিন্তু এই হতভাগ্যকে আলোবাতাস-হীন অন্ধকূপের মধ্যে সেদিন যে রেখে গ্যাছল, এর এই পৈশাচিক মরণে সে কাঁদবে না ত কে কাঁদবে—'

'য়্যাঁ!' যেন ইলেক্‌ট্রিক শকে মেয়েটি মৃতবৎ হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেল, 'হায় ভগবান ...' তারপর দম নিয়ে বলতে লাগল, 'জব্বর মিঞা, আমি আর বাঁচব না, পাঁচ দিন পেটে একটা দানা পড়েনি, এমনি কতদিন পড়েনি। ছেলেটাকে ভিখ্‌ করে খাইয়ে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখছি, ওর জন্য কোথাও আশ্রয় পাইনি, সবখানেই অপমানিত, বিতাড়িত। ভগবান তোমার মানুষকে নিয়েছে, আমার খোকাকে তোমার ছেলে বলে মানুষ কর ... তোমাদের ধর্মে ওর স্থান হবে, ধর্ম যাক, ও যেন শুধু বেঁচে থাকে, ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা ...' অশ্রুসজল কাতরনয়নে সে তাকাল ক্রন্দনরত ঐ বৃদ্ধের দিকে। তারপর সে করুন স্নেহমাখা চোখে তাকাল নিজের ভাগ্যহীন পুত্রের শুষ্ক মুখপানে। কী যেন সে বলতে চাইল, কিন্তু নাভিশ্বাসে তার কণ্ঠ রুদ্ধ। সে শুধু পুত্রের দিকে মরা কাৎলার মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ক্ষণেক পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল; কিন্তু প্রশ্বাস নিতে আর পারল না ...

এই শ্মশানপুরীর মধ্যে মায়ের মরণে তিলোত্তমার বালক সন্তান হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠল ...

একটা বালকের ভয়ার্ত ক্রন্দন শুনে দূর থেকে বড় রাণী সেখানে পৌছলেন। ছেলেটির মুখ দেখে তিনি চমকে উঠলেন। ছ'মাস আগে যে ছেলে তাঁর কোল ছেড়ে চলে গেছে দারিদ্র্য-জর্জরিত কৃশকায় গৌরকান্তি বছর ন'দশেক এই ক্রন্দনরত ছেলেটার চোখে-মুখে যেন তারই ছাপ লেগে রয়েছে ... এ যেন সেই ... কে

এ ··· কার ছেলে এ ··· এ যদি তাঁর সন্তান হত, তাহলে এই রাজ্য ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে-ওঠা বহু উত্তরাধিকারীর মধ্যে আজ ভাগাভাগি হয়ে যেত না ··· তিনি রুগ্নমান বালকের মুখপানে অশ্রুসজল নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে ভাবেন এই কথা ··· ভাবেন একে পোষ্যপুত্র করে এই খণ্ড বিখণ্ড রাজ্যকে জোড়া দেবার কথা ··· ভাবতে থাকেন এমনি অনেক কথাই ···

খাবি খেতে খেতে তিলোত্তমার স্বর্গপ্রাপ্তি দেখে অন্তঃসারশূন্য জব্বরেরও উঠেছিল অন্তঃশ্বাস। দুর্বল পায়ের ওপর নিজেকে সামলিয়ে রাখতে না পেরে সে ঢলে পড়েছিল মৃগেন্দ্রনারায়ণের মৃতদেহের একপাশে আর মুমূর্ষু দৃষ্টিতে দেখছিল শোকাক্লিষ্টা বড় রাণীকে।

যদিও সে কখনো দেখেনি রাণীদের; কিন্তু অনুমানে বুঝতে পেরেছিল বড় রাণীকে আর বুঝতে পেরেছিল তাঁর ব্যথিত জননী-হৃদয়ের ক্ষুধিত ভাবনাটাকে। সে মরতে মরতে ভাবছিল ···

··· মানুষের কামনার কথা, মানুষের পাপের কথা। যে কামনা ও পাপ সংমিশ্রিত হয়ে মানুষকে নিয়ে যায় নরকে। রাজাবাবুর কামনা ও পাপই আজ এই সূর্যগড় রাজ্যকে এনে দিয়েছে চরমতম বিপর্যয়ের পথে, এনে দিয়েছে এই বালককে পৃথিবীর আলো-বাতাসে— যে শুধু পথের ভিখারী হয়ে অকালে ঝরে পড়বে এই পৃথিবীর বুক থেকে, এনে দিয়েছে মৃগেন্দ্রনারায়ণের এই পৈশাচিক মরণ, এনে দিয়েছে তিলোত্তমার এই বিড়ম্বিত মরণ, এনে দিয়েছে তার নিজেরও এই শোচনীয় মরণ ···

প্রত্যান্তর

—পেয়েছি—

আর্কিমিডিসের 'ইউরেকা'র মত আবিষ্কারজনিত আনন্দঘন একটা প্রত্যয়ব্যঞ্জক শব্দ কানে আসতেই মুখ ফিরিয়ে দেখি, কালকের সেই ছেলেটি যে আমাকে বলেছিল, 'এই যে নতুন দাদা, অমন টুকটুকে চেহারাটি নিয়ে ওখানে বসবেন না, চুম্বক আছে টেনে নেবে।' আমার অপরাধ ছিল—কলেজে নতুন ভর্তি হয়ে কাল প্রথম ক্লাসে যাই আর গিয়ে প্রথম সারির বেঞ্চে বসি। আর সেই বেঞ্চির সামনের আড়াআড়ি বেঞ্চিগুলি মেয়েদের বসবার স্থান।

সুতরাং এ হেন ছেলে কী পেল যার জন্য এই আর্কিমিডিসীয় উক্তি। তাই আমি ওর দিকে মন দিলাম। আজকে আমি শেষ সারির একটা বেঞ্চে বসেছি।

ওর কথা শুনে ওর বন্ধুরা ওরফে আমার পাশের বেঞ্চিটার সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠল, 'পেয়েছিস!'

ছেলেটি ঐ বেঞ্চের একপ্রান্তে বসতে বসতে এক মোলায়েম আত্মপ্রসাদের সুরে বললো, 'কনীনিকারা পাঁচ বোন।'

'পাঁচ বোন!' ওর বন্ধুরা আঁৎকে ওঠল।

'বাট নো ব্রাদার, কোন ভাই নেই, কনীনিকা থার্ড, ওর বাবা মুনসেফ—'যেন কোটালপুত্র পাতালপুরীর রাজকন্যের খবর বলছেন রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রদের।

'সত্যি বলছিস্, ওরা পাঁচ বোন।' ওদের মধ্যে একজন বলে ওঠল।

'দেখতে পাস্‌নি, পাঁচবোন না হলে ডেলি এক একরকম শাড়ী পরে আসে কি করে। ওর একার ত আর তিরিশটা শাড়ী হতে পারে না। যাক্‌, পাঁচজনের হিস্ট্রী পাওয়া গেল। হ্যাঁ রে, রেবার খবরটা পেলি ?'

কিন্তু রেবার কাহিনী শোনা হল না। কারণ রেবাদের মূর্তি দেখা দিল।

কনীনিকাকে চিনলাম।

কনীনিকা সুন্দরী, ক্লাসের সেরা সুন্দরী মেয়ে : উজ্জ্বল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, নিটোল যৌবন; আলবার্ট চুল, টানা ভ্রূ, শুকনাসা, হরিণ চোখ, বিসারিত গণ্ড—সুন্দরী বরারোহা।

আর এ হেন কনীনিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটে গেল আমার। আমার মানে পাড়াগাঁয়ের এক স্কুল পণ্ডিতের ছেলের—যে জীবনে এই প্রথম সহরে এসেছে, এসেছে কলেজে পড়তে।

পরিচয়ের কারণটা ছিল অবশ্য আবশ্যিক। কনীনিকার যেটা ফোর্থ সাবজেক্ট, আমারো তাই, ক্লাসের আর কারো তা নেই। তাই কিছু বইয়ের প্রত্যাশায় ওর সঙ্গে একদিন দেখা করলাম মেয়েদের কমনরুমে।

কথাটা ছড়িয়ে পড়ল ওদের কানে। মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল। রাস্তায় ওরা আমাকে ঘিরে ধরল। গাঁয়ের একটী ছেলের পক্ষে এত শীঘ্র এমন একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটানয়, ওরা আমাকে নানা প্রশ্ন ও কটুক্তি করল—'এতো সাবজেক্ট থাকতে বেছে ঐ সাবজেক্টটা নিলে কেন ?' 'বইয়ের আদান-প্রদান করতে গিয়ে হৃদয়ের আদান-প্রদান করো না, সাবধান সতর্কে থেকো, ও হচ্ছে সহুরে খেলোয়াড় মেয়ে, গেঁয়ো ছেলে তুমি, ওর পাল্লায় হাড়ে-হাবাতে মারা যাবে।'

এরও একটা কারণ অবশ্য আছে। ওরা এক একজন ক্লাসের সুন্দরী মেয়েদের এক এক করে ভাগ করে নিয়েছে আর কলেজের আশে পাশের চায়ের দোকান থেকে ছুটির পর তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের নাম

ডাকে। এমনিভাবে ওরা ওদের দখলীসত্বটা ঘোষণা করে; কিন্তু কাছে গিয়ে কাউকে কোন কথা বলতে কোনদিন দেখলাম না।

সতর্ক আমি হলাম; পাছে ওরা না আমাকে শেষ করে ফেলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হল না, মাঝে মাঝে ওদের বিদ্রূপ ছাড়া। কিন্তু বই নেওয়া-দেওয়া আমাদের চলতে লাগল নিয়মিতই।

আই-এ পাশ করে কনীনিকা আর আমি ইংরেজীতে অনার্স নিলাম। ওদের কেউ করল ফেল, কেউ বা পড়তে লাগল শুধু পাশ কোর্সে।

ওদের দলটা হল দুর্বল, আমাদের হল মজবুত। ওদের কটুক্তি গেল কমে।

সারাদিনের মধ্যে অনার্স ক্লাসে কিছু সময় কনীনিকাকে একা একা পেতাম আর এই সময়টার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে রইতাম। কারো বিদ্রূপ নেই, কারো কটাক্ষ নেই। বেশ নিরিবিলি, শুধু দুজন।

প্রথম প্রথম অবশ্য আবশ্যিক কথা ছাড়া কোন অনাবশ্যক কথা হত না—যা হয়েছে গত দুবছর।

'পার্শিভালের ম্যাকবেথের নোটটা দেবেন—?'

'দেব না কেন ?'

'দয়া করে কালকে আনলে ভাল হয়।'

'আচ্ছা।'

ব্যস! এই পর্যন্ত। একেবারে নির্বিকার। ঠোঁটের প্রান্তেও একটু হাসি নেই; অথচ ঐটুকু দেখবার আমার কি ইচ্ছা!

অনাবশ্যক কথা অবশ্য আমাকেই পাড়তে হ'ত।

'কেমন আছেন—?'

'কালকে আসেন নি কেন ?'

'এতো শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?'

'পেটের অসুখ করেছে! কষে বুঝি কাঁচা লঙ্কা খেয়েছেন—?'

কনীনিকা হেসে উঠতো। আর সঙ্গে সঙ্গে গালে পড়তো টোল।

আর আমার মর্মতীরে লাগতো তার ঢেউ।

কনীনিকা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী খাচ্ছেন? আপনাকে প্রায়ই যেন কী খেতে দেখি?'

'খাবেন—?' বলে পকেট থেকে কয়েকটা লজেন্স বের করে ওর দিকে হাত বাড়ালাম, 'নিন।'

'লজেন্স!' চোখ ছানাবড়া করে ও আঁৎকে উঠলো, 'আপনি লজেন্স খান? না, না, না, ওসব ছেলে-মানুষি জিনিস আমি খাই না,' বলে তরুণী প্রবীণার মত গম্ভীর হয়ে ওঠল।

'আপনি তো কোনকালে ছেলে-মানুষ ছিলেন না যে লজেন্স খেয়ে থাকবেন, ভারি চমৎকার জিনিষ, এখন খেয়ে পরীক্ষা করুন!'

কনীনিকা হেসে উঠলো এবং বালিকার মত হাতটি বাড়িয়ে দিল। আর আমারই দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে লজেন্স চুষতে লাগল।

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায় ···

কলেজ-জীবনের থার্ড ইয়ার যে কী সাংঘাতিক সময় মানুষের জীবনে—তা শুধু তারাই জানেন যারা পড়েছেন থার্ড ইয়ারে। জগতের সব কিছু জয় করবার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হিমালয় ডিঙ্গানো থেকে মহাকবি হওয়া—সবই যেন তখন হাতের পাঁচ। এ ধারণাটা আমার বদ্ধমূল হল কলেজ পত্রিকার ছাত্র-সম্পাদকের পদটা পেয়ে। কলেজের ছাত্রসংখ্যা যত তার চেয়ে লেখা এলো বেশী—যেন বাঙলা-সাহিত্যের ভাবী লেখকগোষ্ঠী সবাই এই কলেজে শিক্ষানবীশ এবং তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমার কারুণ্যের উপর। একই লেখক হয়তো পনেরটা কবিতা, দশটা গল্প, পাঁচটা প্রবন্ধ দিয়েছে। এই শত শত লেখা থেকে নিতে হবে মাত্র কয়েকটা। ছাত্র-সম্পাদকরূপে

তার প্রাথমিক নির্বাচন আমার হাতে; আমার মনে হল 'সবুজপত্র' সম্পাদকের উত্তর দায়িত্বটা যেন আমার উপর এসে পড়েছে।

কিন্তু এই স্তূপীকৃত লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে এমন দু'একটা গল্প বা কবিতা পেতাম যা পড়তে পড়তে পেটে খিল ধরে যেত। যুগ্ম রসাস্বাদনের জন্য এই লেখাগুলি আমি অনার্স ক্লাসে আনতাম। আমি পড়ে যেতাম আর কনীনিকা হেসে লুটিয়ে পড়তো। সংকোচের ব্যবধান আমাদের মধ্যে আরো আসতো কমে; অপরের হৃদয়ের মাধ্যমে আমরা পরস্পরের হৃদয়ের কাছে নিবিড় হতে লাগলাম।

কলেজ পত্রিকায় এবারেও আমার গল্পটি হল প্রথম। কনীনিকা আমাকে জানাল লিখিত অভিনন্দন—সবুজ খামের মধ্যে সবুজ কাগজে।

নিজেকে মনে হল বাঙলা-সাহিত্যের দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমি বিমুগ্ধ—হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।

যার সঙ্গে হয় দৈনিক দেখা এবং একক দেখা, অভিনন্দন তাকে তো মুখে জানাতে পারতো, লিখে কেন?

কনীনিকার মনের কথা আমি জানি না; কিন্তু তার হৃদয়ের খবর আমার জানা হয়ে গেল।

সুন্দরী বিদুষী তরুণীর দয়িত আমি—এরপর আর কিছু ভাবা যায় না, ভাবতেও পারি না। শুধু মনে হল বাঙলা দেশের সেরা সুন্দরী বিদুষী তরুণীরা আমার সহজলভ্য, ইচ্ছে করলে খুসীমত এদের একটিকে বেছে নিতে পারি।

এমনি বুঁদ নেশার মাঝখান দিয়ে থার্ড ইয়ার কেটে গেল। ফোর্থ ইয়ারও যায় যায়। এমনি সময় পূজোর ছুটির প্রাক্কালে একদিন কনীনিকা আমাকে বললো 'আমরা চলে যাচ্ছি।' হঠাৎ কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ও বললো, 'বাবা ট্রান্সফার হয়েছেন।'

'ট্রান্স্ফার ! কোথায়' ...

'রাজসাহীতে ।'

'কবে যাচ্ছ ?'

'দিন পনেরর মধ্যে ।'

কনীনিকা যে কোনদিন আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে—একথা কখনও আমার ভাবনায় স্থান পায় নি। তার চলে যাওয়া কথাটা আমার কানের ভিতর দিয়ে মর্মে যেন শেল বিঁধলো। আমার মানসীকে আর চোখে দেখতে পাবো না—বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করলাম—ব্যথায় বুকটা টনটন করে উঠলো।

রাস্তায় নেমে ওকে বললাম, 'চল না, বিদ্যাসাগর হল থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।' ও আমার কথায় সায় দিল।

'বিদ্যাসাগর হল' সংলগ্ন উদ্যানের এক নিভৃত অংশে ঘাসের ওপর দুজনে মুখোমুখি বসলাম। দেশী-বিদেশী নানা ফুলের গন্ধ নাকে ঢুকছে, রূপ চোখে লাগছে। মনে হল সমস্ত ফুল যেন তাদের রূপ গন্ধ কনীনিকাকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছে—কনীনিকার মনে পাচ্ছি তার গন্ধ, দেহে পাচ্ছি তার রূপ—কনীনিকা কী অপূর্ব অপরূপ !

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা কনীনিকার মুখে এসে পড়েছে—রক্তিম দ্যুতিতে ওর মুখমণ্ডল দেদীপ্যমান—যেন নন্দনবাসিনী কোন অপ্সরী !

'শুধু কী চুপটী করে বসে থাকার জন্যেই এলে ?'

কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম, 'তুমিও কি ট্রান্স্ফার নেবে ?'

'না নিয়ে আর উপায় কি।'

'কেন, তুমি এখান থেকেই পরীক্ষাটা দিয়ে দাও না, দু'এক মাসের জন্য কলেজ বদলিয়ে লাভ কী, তাছাড়া অন্য কলেজে 'কোস' এর তো অসুবিধা আছে।'

'বলেছিলাম, বাবা রাজী নন—'

ওর বাবা যদি রাজী না হন, আমিই বা আটকিয়ে রাখবো কীসের জোরে, কীসের অধিকারে আমি ওকে বলবো - যেতে নাহি দিব।

কী কথাই বা বলি, তবুও বলতে হয়, 'এম-এ পড়বে তো?'

'তার এখন ঠিক কী, পাশ করি—'

'তুমি পাশ করবে না! তাহলে সবাই ফেল করবে।'

'ঢের হয়েছে—'

'কেমন পড়াশোনা কর, জানিও।'

'জানাব'

কথা ফুরিয়ে যায়, চুপ করলাম। কিন্তু যে কথাটুকু বলবার জন্য ওকে এখানে আনলাম—সেটা কিছুতেই বলতে পারছি না, কেবল লজ্জা এসে বাধা দেয়।

আকাশের দিকে তাকালাম।

দিনান্তের শেষ সূর্য কখন অস্ত গেছে জানি না, পাতলা আঁধার চারিদিক কখন ছেয়ে ফেলেছে জানি না। শরতের শুভ্রাকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ হংস-বলাকার মত উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে। কোন দূর শতাব্দীর বিরহী যক্ষের বিরহ-বার্তা সে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল রামগিরি থেকে সেই হিমালয়ের পরপারে অলকাপুরীতে তার বিরহিণী প্রিয়ার কাছে। যুগ-যুগান্ত ধরে সে দিয়েছে কতো বিরহীকে আশা, কত বিরহিণীকে আনন্দ। মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললাম, হে পয়োদ, আজো কি তুমি পূর্বের মত দৌত্যকার্য করে থাকো?

'আকাশে কী দেখছো?'

ফিরে তাকালাম। খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে কনীনিকার মুখে। কনীনিকাকে মনে হল স্বপ্নময়ী অলকাপুরীর মায়াময়ী রূপসী। মুগ্ধ নয়নে তার অপরূপ রূপ দেখতে লাগলাম।

কনীনিকা ধরে ফেলে আমার বিহ্বলতাটুকু।

'রাত্রি হল, এবার ওঠ,' বলে ও ওঠবার চেষ্টা করল।

'আর একটু বসো,' বলে ওর ডান হাতটা টেনে নিলাম, 'জীবনে হয়তো আর কখনো তোমাকে দেখতে পাবো না ··· কনি, কোন জনমানবহীন রাজ্যে দুই বিপরীত দিক থেকে আসতে আসতে দুটি তরুণ তরুণী যদি বনবীথিকায় একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ে, তারা থমকে দাঁড়িয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে; তারপর তারা কী করবে?'

'ও সব হেঁয়ালি আমি জানি না, তবে সম্ভবতঃ তারা যেমনি আসছিল, তেমনি চলে যাবে।'

'না, কনি, তারা চলে যায় না, তারা নীড় বাঁধে। ··· তোমাতে আমাতে কী নীড় বাঁধা যায় না।'

'নীড় বাঁধতে হলে চাই উপকরণ, নইলে গাছতলায় বসতে হবে ··· তুমি ভালোছেলে, ভালোভাবে পড়াশোনা কর, আমার চেয়ে অনেক ভালো মেয়ে পাবে।' হাতটা টেনে নিয়ে কনীনিকা উঠে দাঁড়াল। তারপর বললো, 'ওঠ।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'আমাকে বাসায় ছেড়ে দিয়ে যাবে চল, দেড় মাইল ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে একা একা যেতে আমার ভয় করে।'

কঙ্করময় বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে পশ্চিমদিকে তারই অপরপ্রান্তে কনীনিকাদের বাসা।

কনীনিকার পাশে আমি চলেছি—আগে তো কতবার ওর পাশে চলেছি। কিন্তু সে চলার আর আজকের চলার মধ্যে কী গভীর ব্যবধান। আজ আমি যন্ত্র। প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে।

দুজনেই নির্বাক। শুধু সারীবন্দী ঝাউগাছের মর্মভেদী শোঁ শোঁ শব্দ।

সারা পথটা আমি শুধু এই ভাবতে ভাবতে চললাম কনীনিকা যদি জানতো যে মুনসেফের মেয়ের সঙ্গে ইস্কুল পণ্ডিতের ছেলের নীড় বাঁধার অর্থ ও অধিকার কোনটাই নেই, তবে কেন সে চার বছর ধরে ভালোবাসা নিয়ে টেনিস খেলা খেললো ?

বাসার কাছে ওকে পৌঁছে দিয়ে 'চলি' বলেই চলতে সুরু করলাম। কয়েক পা গিয়েছি এমন সময় ও আমাকে ডাকলো, 'শোন।' ফিরে এসে ওর সামনে দাঁড়ালাম। অস্তগামী চন্দ্রের বিদায়ী আলোতেও আমি দেখতে পেলাম ওর কপোল বেয়ে জল পড়ছে। কনীনিকা কী তাহলে আমাকে ভালোবাসে—মনে জাগলো প্রশ্ন। 'আমাকে তুমি ভুলে যেও,' ওর কণ্ঠে আদ্রস্বর। এই কথাটাই কী শোনাবার জন্য ডাকলো! একথা তো না বললেও চলতো। কিন্তু আমারো বলতে ইচ্ছা করলো, 'তোমাকে যে কোনকালে ভুলতে পারবো না, কনি,' কিন্তু কোন কথা না বলে মেসের পথে আবার চলতে সুরু করলাম।

ছিট কয়দিন কলেজ যাওয়া বন্ধ করলাম।

জীবনটাকে অসম্ভব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল। সেই শূন্যতা পাক দিয়ে খেয়ে ভিতর থেকে ঠেলা দিতে লাগল—বুকের পাঁজর উঠলো কেঁপে। রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখলাম কনীনিকাদের বাসার সামনে এসে আমি উপস্থিত। মেন-গেটে তালা ঝুলছে। দরজা-জানালা সব বন্ধ। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। বিরাট প্রান্তরের মধ্যে এই বাড়ীটাকে মনে হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন পোড়ো বাড়ী, শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তুরূপে আজো বিদ্যমান।

এইখানে তো সেদিন সে তাকে ভুলে যেতে আমাকে বলেছিল। এতোদিনে বিশ্বাস হল কনীনিকা সত্যিই 'খেলোয়াড় মেয়ে'—যাযাবরী যাদুকরী। এমনি করে আরো কত জনের জীবন নিয়ে সে ছিনিমিনি

খেলছে তা কে জানে! তার প্রেমের কাঠির স্পর্শে আমার তরুণ হৃদয়-কোরকের এক এক করে পাঁপড়ি সে খুলে দিয়েছিল—তারপর একদিন পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পটিকে নিষ্ঠুরভাবে দলিত করে চলে গেল। আমাকে যদি তার জীবন-সঙ্গী করবার ইচ্ছা নাই ছিল; কিন্তু সেকথা তো সে আমাকে ঘুরিয়েও বলতে পারতো। সত্যিই মুন্‌সেফের ঐ খেলোয়াড়ী মেয়ে পাড়াগাঁয়ের ইস্কুল পণ্ডিতের এই বোকা ছেলেকে 'হাড়ে-হাভাতে' মেরে দিয়ে গেছে। নইলে পড়তে বসলে পড়তে পারিনা কেন? 'কীটসের কবিতা'র উপর, 'কমলাকান্তের জবান-বন্দী'র উপর, 'ওয়াটারলু-যুদ্ধে'র উপর, 'পপুলেশন থিয়োরী'র উপর কেন ভেসে ওঠে ওর মন-মোহিনী মুখ।

তবু পরীক্ষা দিলাম; কেমন দিলাম—তা আমি জানি; কিন্তু অধ্যাপকরা জানতেন অন্য রকম। তাই ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে নামটা যখন নেমে এলো সেকেণ্ড ক্লাসে, তাঁরা দোষারোপ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের।

ভাঙ্গা হৃদয়কে জোড়া দেবার একটা দুরাশা নিয়ে প্রবেশ করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু কনীনিকাকে দেখতে পেলাম না।

কনীনিকা সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়েও কেন পড়তে এলো না, জানি না।

তারপর ...

তারপর কখন যে এক একটী বসন্ত চলে গেছে, আর আয়ু থেকে খসে গেছে এক একটি বছর—তার হিসাব জানি না। ক্রমে চুলে ধরেছে ধূসরতা, দেহে এসেছে শীথিলতা।

সংসারের শতকর্মের চাপে কনীনিকার স্মৃতি বিস্মৃতির কোন স্তরে বাসা বেঁধেছে—তা জানি না। কোনো কর্মহীন অলস অপরাহ্ন-

বেলায় অতীতের কাহিনী যখন বিস্মৃতির অন্ধকার দ্বার ঠেলে স্মৃতির আলোকে এসে পৌঁছে, তখন কনীনিকার কথা মনে পড়ে; কিন্তু তা স্বপ্ন বা শিশুকালে শোনা রূপকথার কাহিনীর মতো। কনীনিকার মুখচ্ছবি স্মৃতির পট থেকে কবে যে লোকালয়ের মধ্যে এসে একাকার হয়ে গেছে—তারও হিসেব আজ আমার কাছে নেই।

পূজাবকাশের পর কলেজ খুলে গেল। থার্ড ইয়ার ক্লাসে পড়াতে পড়াতে চমকে উঠি একটি ছাত্রীকে দেখে। মেয়েটিকে মনে হল ভয়ংকর চেনাচেনা, অথচ চিনতে পারছি না। স্মৃতির রোমন্থন করে যে মেয়েটিকে খুঁজে পেলাম, এ মেয়েটি হল সেই কনীনিকা—সেই রূপ সেই চোখ, সেই নাক, সেই চুল, এমন কি গালের টোলটি পর্যন্ত। হঠাৎ কোন্ মন্ত্রবলে পঁচিশ বছর পূর্বের সহপাঠিনী কনীনিকা আমার সামনে ছাত্রীরূপে উপস্থিত হল! সে কী উর্বশী যে চিরন্তন তন্বী থাকবে! এতোদিনে মোটিয়ে তার কিম্ভূত কিমাকার হওয়ার কথা! এ কে …?

অনুসন্ধানে জানলাম এ মানব দুহিতা কনীনিকার নন্দিনী—দীপান্বিতা দাশগুপ্তা—নতুন মুনসেফের দ্বিতীয়া তনয়া, তৃতীয় সন্তান।

'কনীনিকা-কাহিনী' মনের মধ্যে নতুন করে দেখা দিল, কনীনিকাকে দেখবার, তার অবস্থা জানবার একটা প্রবল বাসনা হৃদয়ের এক কোণে জন্ম নিল। এই বাসনাটা যদিও অহেতুক কৌতূহলের নামান্তর মাত্র; তথাপি আরো পাঁচজন সভ্য সামাজিক মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষা, নানা কৌতূহল চেপে রাখার মতো আমাকেও আমার এই কৌতূহলটা চেপে রাখতে হল।

গ্রীষ্মাবকাশের কয়েকদিন পূর্বে একদিন কলেজ থেকে এসে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছি। একটু তন্দ্রা এসেছে।

'—এটা কী প্রদীপবাবুর বাড়ী—প্রফেসর প্রদীপবাবু—'

নিশি নাকি ডাকে, কিন্তু দুপুরও কী ডাকে ?

গিন্নী দরজা খুলে দিল।

'প্রদীপবাবুর বাড়ী ?'

না, এ ডাক দুপুরের নয়, এ ডাক দীপান্বিতার।

'হ্যাঁ।'

'উনি কী বাড়ীতে আছেন ?'

'পুড়ে যে একেবারে লাল হয়ে গেছ, ভিতরে এসো মা—'

বাঙলা-দেশের পশ্চিমের এই সহরটায় তাপ এই সময় অত্যধিক হয়, মাঝে মাঝে একশ' দশ ডিগ্রী পর্যন্ত; আজকের দিনটিও তার অন্যতম। সুতরাং এই রৌদ্রে মাইল দেড়েক হেঁটে আসায় দীপান্বিতার গৌর মুখখানি যে বেশ রাঙা হয়ে উঠেছে, কল্পনেত্রে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এই ভর দুপুরে হঠাৎ তার এমন কী প্রয়োজন ঘটলো প্রদীপবাবুর কাছে!

'বসো মা—'

'আমাকে দিন, পেতে নিচ্ছি, উনি কলেজ থেকে এসেছেন ?'

'ছিঃ! ছিঃ! ওকি করছেন, পাখাটা আমাকে দিন, উনি এসেছেন ?'

'না, আসেনি।'

'এখনো আসেন নি! সেই তো এগারটায় কলেজ ছুটি হয়েছে!'

'কোথায় বসে বসে গল্প করছে— ছোটবেলা থেকেই আমাকে জ্বালিয়ে পুড়ছে—'

'আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি প্রদীপবাবুর মা—'

প্রদীপ আমাদের একমাত্র সন্তান। সে তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে গায়ের রং, আমার কাছ থেকে কী পেয়েছে, জানিনা; তবে একুশ বছর বয়সে সে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে এম-এ পাশ

করেছে। বর্তমানে সে এই কলেজের ইংরেজী-সাহিত্যের কনিষ্ঠ অধ্যাপক।

'থাক্ মা, প্রণাম করতে হবে না, আয়ুষ্মতী হও, তোমার নামটি কী মা—'

'আমার নাম দীপান্বিতা দাশগুপ্তা—ডাক নাম দীপা—'

'বা, বেশ তো, আমার প্রদীপের ডাক নাম দীপু—ঐ যে দীপু আসছে—'

'তুমি যে—!'

'পরশুদিন পরীক্ষা, শেলীর কবিতাগুলো বুঝিয়ে দিলেন না, আমাদের বাসায় যাবেন যাবেন বলে চারদিন কাটিয়ে দিলেন; তাই নিজে এলাম—'

'তাই বলে এই দুপুরে! ··· মা, বাবা খেয়ে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তিনি শুয়ে পড়েছেন।'

'যাক্, আমার ঘরে এসে বসো, স্নান করে দু'টি খেয়ে নিই—'

'না, মা, তুমিও হাত-মুখ ধুয়ে ফেল—'

'না, মা, আমি খেয়ে এসেছি—'

'না খেয়ে কী এমনি এসেছ? খেয়ে এসেছ, তা জানি।'

'না মা, তখন আর একদিন খাবো—'

'খাওয়া-দাওয়ার সময় এসেছ, না খেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।'

'বেশ, উনি খেয়ে নিন, আমি আপনার সঙ্গে খাবে।'

উৎকর্ণ হয়ে সবই শুনলাম। মনে একটা অহেতুক শঙ্কার ক্ষণিক উদয় হল।

প্রদীপ দীপান্বিতাকে পড়াতে সুরু করল এবং এক একদিন দীপান্বিতার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরতে লাগলো। আর দীপান্বিতাও পড়া বুঝবার জন্য প্রায় প্রত্যহ এ বাড়ীতে

আসতে লাগলো এবং এসেই ছাত্রীর বদলে বধূ হয়ে উঠতো অর্থাৎ তরকারী রান্নায়, কুটনো কোটায়, মসলা বাটায় সে হয়ে উঠতে গিন্নীর সহায়ক।

ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়—আমার অবস্থা হল তাই। বেশ বুঝতে পারলাম, প্রদীপ-দীপান্বিতার ঘনিষ্ঠতা শেষে প্রেমে পর্যবসিত হবে। তারপর ঘটবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—অর্থাৎ দীপান্বিতারা বদলী হয়ে যাবে কিংবা এদের বিয়েতে কনীনিকা রাজি হবে না। দীপুর অবস্থাটা তখন হবে ঠিক বি-এ পরীক্ষা দেবার সময় আমার অবস্থার মত। ছেলেটা হয়তো বিলেত যাবে না, যদি বা যায় ফেল করে আসবে, ষ্টেট স্কলারশিপের টাকাটা জলে যাবে ··· কিন্তু কী করি ··· ছেলেকেও বলতে পারি না, তুমি ওকে পড়াতে যেও না কিংবা গিন্নীকেও বলতে পারি না, দীপাকে তুমি আস্কারা দিও না। মনের যখন এমনি ত্রিশঙ্কু অবস্থা তখন একদিন গিন্নী আমাকে বললো, 'জরুরী একটা কথা আছে। পড়াটা একটু বন্ধ রাখবে?' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হলে গিন্নী কখনও এমন ভঙ্গীতে কথা বলে না। তাই হাতের বইটা সরিয়ে রেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

'দীপুর বিয়ে দাও।'

দীপুর বিয়েটা আবার হঠাৎ গুরুত্বপ্রাপ্ত হল কেন বুঝে উঠতে পারলাম না। এই তো সেদিন ঠিক হল বিলেত থেকে ফিরে না এলে ওর বিয়ে দেব না। তাই বললাম, 'কী হল আবার?'

গিন্নী আমাকে একটি ফটো দিল—ফটোটি দীপান্বিতার!

নির্মল আকাশের মত সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল।

মনে পড়ল, এমনি ভঙ্গীর ওর মার একটা ফটো এক সময় আমার কাছে ছিল, পরে সেটা আমি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।

'আরো দেখ,' গিন্নী সবুজ খামের কতকগুলি চিঠি আমাকে দিয়ে

বললো, 'দীপুর বিছানা ঝাড়তে গিয়ে তোষকের নীচ থেকে এগুলি বেরিয়ে এলো।'

মনে পড়ল, দীপার মায়ের চিঠিগুলির কথা। একদিন আমি সেগুলির অগ্নিপ্রাপ্তি ঘটিয়েছিলাম।

খাম থেকে একে একে চিঠিগুলি বের করলাম। তারিখ মিলিয়ে সাজালাম। প্রথমটী পাঁচ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়টি দশ, তৃতীয়টী তের এবং শেষেরটি তিরিশ পৃষ্ঠা।

যার সঙ্গে সকাল, সন্ধ্যে, দুপুরে শুধু দেখা নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হয়; তাকে আবার এতো লম্বা লম্বা চিঠি কেন! চিঠিগুলি পড়বার লোভ হলেও গিন্নীর সামনে পুত্রের দয়িতার চিঠি পড়তে বাধ বাধ ঠেকল। শুধু পাতাগুলো উলটিয়ে গেলাম। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত কবিতার ছড়াছড়ি—তাও আবার মাঝে মাঝে লাল নীল পেনসিলে দাগ দেওয়া। পরিণতি কদ্দূর গড়িয়েছে জানবার জন্য শেষ চিঠিটার পাতা একটু আস্তে আস্তে উল্টালাম। একটা জায়গায় লাল নীল পেনসিলে বেশ মোটা মোটা দাগ দেওয়া। 'গত চিঠির উত্তর এখনও দিলেনা কেন? তারজন্য একদিন কথা বন্ধ। শনিবার পড়াতে এলে না কেন? তারজন্য দু'দিন কথা বন্ধ! কথা দিয়ে রবিবার সিনেমা গেলেনা কেন? তারজন্য তিনদিন কথা বন্ধ। মোট ছ'দিন কথা বন্ধ।'

—বাপ্‌রে!—মনে মনে আঁৎকে উঠলাম।

মনে পড়ল, ওর মা ত' একটিও এমনি কথা কখনও লেখেনি। কিন্তু সে যে ছিল সেকাল। এ যুগ হয়েছে যেমন, এ যুগের মেয়েরাও ত হবে তেমনি। যাক্, সে কথা।

বুঝলাম, উভয় পক্ষই অনেকদূর এগিয়ে গেছে: তবে দীপার দৌড়ে দীপু তাল রাখতে পারছে না। চিঠিগুলি ভাঁজ করতে করতে গিন্নীকে তাই বললাম।

খুসী মনে গিন্নী বললো, 'তবে এদের বিয়ের বন্দোবস্ত কর।'

কনীনিকার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে—আমি শিউরে উঠলাম! 'কী যে বল তুমি, জজ-মুনসেফের মেয়েকে আমাদের বাড়ীতে দেবে কেন!'

'দেবে না কেন? আমরা এমন কীসে খাটো, তুমি একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক। দীপু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রত্ন।'

'কিন্তু জজ-মুনসেফের মেয়ের সঙ্গে জজ-মুনসেফের বিয়ে হয়—জানতো, দীপার দাদাবাবু, জামাইবাবু, কাকাবাবু, বাবা—কেউ মুনসেফ, কেউ জজ।'

'চেষ্টা করে একবার দেখ না—দীপা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে গো—'

'আমরা এগিয়ে যাই কী করে। তা'ছাড়া ওরা যদি না বলে বসে, তা'হলে অপমান ঢাকবার আর স্থান থাকবে না।'

বুকের ভিতরের সব বাতাসটা টেনে বের করে গিন্নী একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। আর তা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল ঘড়িতে ঢং ঢং।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গিন্নীকে বললাম, 'দশটা হ'ল, দীপু এবার পৌঁছবে। এগুলো যেখানে যেমন ছিল সেখানে রেখে দাও।' বলে গিন্নীর হাতে দীপান্বিতার ফটো ও চিঠিগুলি দিলাম।

দিন কয়েক পরে একদিন কলেজ থেকে এসে জলযোগান্তে বিশ্রাম করছি। গিন্নী হাসতে হাসতে বললো, 'তোমার মতন ভীতু মানুষ দুনিয়ায় দু'টি নেই, তুমি যা পারলে না, আমি মেয়ে-মানুষ হয়েও তাই করলাম।' আমার উপর গিন্নীর বেচারী বেচারী ভাবটা আজ নতুন নয়; সুতরাং কোন প্রতিবাদ না করে শুধু বললাম, 'অর্থাৎ—'

'অর্থাৎ, ওদের বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছি, দীপার সঙ্গে আজ ওদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছলাম। দীপার মা বেশ লোক, কথাবার্তা

চাল-চলন বেশ ভদ্র। কথায় কথায় উনি জানালেন ওদের দু'জনে তো ভারী ভাব, ওদের বিয়েতে আমরা যদি দয়া করে রাজি হই, ওঁদের নাকি উদ্ধার করা হবে। আমার মতটা আমি দিয়ে এসেছি, কিন্তু তোমার মতটা যে আসল—তা বলেছি।'

গিন্নি যেমন জানে, আমিও তেমনি জানি—আসল মতটা দেওয়া হয়ে গেছে এবং এ বিয়েটা সুনিশ্চিত।

পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে মেঘে-ঢাকা অস্ত সূর্যের দিকে চেয়ে জীবনের এই অপরাহ্ন বেলায় আমি শুধু ভাবতে লাগলাম পঁচিশ বছর পূর্বের ও আজকের কনীনিকার কথা। কনীনিকা কী জানেনা একদিন যাকে সে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই প্রবঞ্চিত দরিদ্রের ছেলের সঙ্গে আজ সে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছে? ··· নিশ্চয়ই জানে। যার হাতে সে তার মেয়েকে সমর্পণ করতে চাচ্ছে, তার পূর্ণ পরিচয় সে নিশ্চয় নিয়ে নিয়েছে। তবু সে কেন তার হাতে তার মেয়েকে সমর্পণ করতে চায়? ··· সে জেনেছে, এক গ্রাম্য নগণ্য ইস্কুল পণ্ডিতের ছেলে নয় প্রদীপ; সে জেনেছে, নীড় বাঁধবার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে প্রদীপের; সে বুঝতে পেরেছে, গাছতলায় বসতে হবে না তার মেয়েকে ··· কিন্তু কেনই বা সে প্রদীপ বা গিন্নীর কাছে গোপন রেখেছে আমাদর পূর্ব পরিচয়? সে অন্ততঃ শুধু বলতে পারতো একদা এই কলেজে আমরা সহাধ্যায়ী ছিলাম। সে কী ভেবেছে তার পরিচয় জানতে পারলে পাছে আমি এই বিয়ে ভেঙ্গে দিই ··· না, তার স্মৃতির পট থেকে আমার স্মৃতি গেছে সম্পূর্ণ মুছে ··· কে জানে ···

সত্যিই, আশ্চর্য এই মানুষ, আশ্চর্যতর এই মানুষের মন; কিন্তু তার চেয়ে আরো আশ্চর্য রমণীর মন ···

মরুহরিণীর স্বয়ংবর

লেক এভিন্যুর ওপর জাহাজ প্যাটার্নের আধুনিকতম একটী দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার অভ্যন্তরের আধুনিকতা ঘোষণা করছে তার বাসিন্দাদের আভিজাত্য ও রুচি। মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে প্রতিটী কক্ষ সুসজ্জিত—বিশেষ করে ড্রয়িং রুমটী।

ফিকে সবুজ রঙের পর্দা ঠেলে ড্রয়িং রুম থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো একজন সুবেশা স্বর্ণকান্তি তরুণী—পরণে নিম্নাঙ্গে মৃত্তিকাস্পর্শী শুধু সিল্কের শায়া, উর্ধ্বাঙ্গে দেড়গজী সাদা সূতির থান, তার এক প্রান্ত কটিতটের দক্ষিণাংশে শায়ার সঙ্গে যুক্ত, অপর প্রান্ত ব্লাউসের উপর দিয়ে বাম স্কন্ধে লম্বিত। তার পায়ের স্যাণ্ডেল সূচিকার্য-খচিত, লাইমজুস নিষিক্ত ধূসর বব কেশ হেয়ার-পিনে নিয়ন্ত্রিত। বিদেশী প্রসাধন প্রসাদে মুখাবয়ব চকোলেট রঙয়ের নূতন অস্টিন গাড়ীর মত চকচকে। নখের ম্যানিকিওরিং ঔজ্জ্বল্যে রক্তিম দীপ্যমান—আঙ্গুলের মাথায় যেন দেহের দীপালি-উৎসব।

তরুণী বারন্দা থেকে নামলো প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের সামনে বেশ খানিকটা স্থান জুড়ে পুষ্পোদ্যান। দেশী-বিদেশী নানাবর্ণের পুষ্পে বাগানটী শোভিত। বাগানের অন্য তিনদিক পরিক্রমা করে রয়েছে তিন ফুট উচ্চ প্রাচীর ও প্রাচীরস্থ ছ'ফুট উচ্চ লৌহ-রডের বেষ্টনী। পশ্চিমদিকে ঠিক প্রাঙ্গণ ও বাগানের সঙ্গমস্থলে মেন-গেট।

তরুণী প্রবেশ করল উদ্যানে। পুষ্পের মদির গন্ধ তার চিত্তকে করে তুলল ঈষৎ বিহ্বল। পায়চারীর সঙ্গে সঙ্গে সে সুরু করল

গান। মধুপের গুঞ্জন ও তার গুন গুন গান সৃষ্টি করল এক মিলিত ঐক্যতান। গান গাইতে গাইতে সে কখনও বা তাকায় পথপ্রান্তে, কখনও বা কব্জি-ঘড়ির দিকে।

খানিক পরে জনৈক সুবেশ তরুণকে আসতে দেখে গেটের কাছে এগিয়ে গেল সে। সহাস্যে তাকে বলল, এই বুঝি তোমার পাংচুয়েলিটি, কোন বাঙালী কী কোনকালে পাংচুয়্যাল হতে পারবে না।

—আই বেগ ইওর পার্ডন, স্মিতি; সবাই বুঝি এসে গেছে—এদিক-ওদিক তাকিয়ে তরুণটি আবার বলল, কিন্তু কাউকে তো দেখছি না—

—অন্যকারো সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ নেই, চারটেয় অন্য কারো আসার কথা নয়—

—মানে—

—কার্ডে দেখেছ ছাপান সময়টা কাটা এবং ওটা শুধু তোমারটায়—

—অর্থাৎ বাকী সবাইকে ডেকেছ ছটায়—

—ঠিক তাই—

—মানে—

—কিউরিসিটি ইজ এ ফেমিনাইন ভাইস্। আচ্ছা, প্রিয়, আজকাল তুমি এতো ইনডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছো কেন, এদিক যে আর মাড়াও না—

—সময় পাই না—

—সময় পাও না! চব্বিশটা ঘণ্টা কী করে খরচ কর শুনি—

—কলেজে যেতে হয়—

—কিন্তু আগে তো তেমনি ইউনিভারসিটিতে যেতে; শুধু পার্থক্য এখন তুমি প্রফেসর, তখন ছিলে ছাত্র—

—বারে, এখানে দাঁড়িয়েই বুঝি ঝগড়া করবে—

—বারে, ঝগড়া করলুম কোথায়। বেশ, বাগানে চল, কিন্তু তোমাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে—

কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবার তার হল না সময়; কারণ তরুণীর জনৈকা বান্ধবীর সেখানে হল আগমন।

এই তরুণী কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার অপূর্ব ব্যানার্জীর দ্বিতীয় সন্তান, প্রথমা কন্যা—স্মিতা ব্যানার্জী। কন্যারত্নকে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েই অকস্মাৎ স্ত্রীর স্বর্গ-গমনে তিনি একাধারে হয়ে ওঠলেন কন্যার পিতা ও মাতা। তাই সাহস পেলেন না মাতৃহীনা অসহায় কন্যার বিমাতা আনবার। তাছাড়া জীবনে শুধু তাঁর লক্ষ্য ছিল অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। তাই সময়ও হল না দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের; শুধু কন্যার জন্য নিযুক্ত করলেন একজন ইংরেজ-গভর্ণেস।

পিতার কাছ থেকে স্মিতা পেয়েছিল স্নেহ ও স্বাধীনতা—আর ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে শিক্ষা ও আধুনিকতা। তাই স্কটিশচার্চ কলেজে ঢুকে পিতার দেওয়া আদুরে নাম 'সুস্মিতারাণী'র মধ্যে সে দেখতে পেল আধুনিকতার অভাব। ফলে নামের 'সু' ও 'রাণীত্ব'টুকু স্রেফ দিল বাতিল করে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্রে সাধন করল তার পরিবর্তন। তারপর সে একে একে পাশ করল আই-এ, বি-এ, এম-এ। ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে সে এই বছর ত্যাগ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়।

আজ তার জন্মদিন।

আর সেই উপলক্ষে সে নিমন্ত্রণ করেছে তার বিশেষ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের।

উপস্থিত সে এই বাড়ীর কর্ত্রী এবং মালিকও বটে। কারণ, কোর্ট থেকে তার পিতা ফিরেন কোনদিন বা রাত্রি নটায় কোনদিন বা দশটায়। আর তার দাদা বর্তমানে আছেন বিলেতে—বছর তিনেক পূর্বে ব্যারিষ্টারী পড়ার উদ্দেশ্যে সাগরপারে দিয়েছে পাড়ি।

সুতরাং ঘর-বাহির সব তদারক করতে হয় স্মিতাকেই।

তেমনি সে আজও ঘর-বাহির হচ্ছিল—একদিকে তাকে করতে হচ্ছে বন্ধুদের অভ্যর্থনা, অপর দিকে তাদের ডানহাতের ব্যবস্থা।

একে একে এলো নিমন্ত্রিত সবাই। এলো বীরেন, হিরন্ময়, মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি—এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী সেরা ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের স্মিতা বারোয়ারী বান্ধবী। আর এলো কমল—সে বাঙলায় তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ; কিন্তু তার বিশেষ পরিচয় সে কবি। তাই তার সঙ্গে করেছে হৃদ্যতা স্মিতার মতো প্রতিভাশালিনী ছাত্রীও।

নাচ-গান, হাসি-তামাসায় ড্রয়িং রুমের আবহাওয়াটি হয়ে উঠল বেশ জমজমাট। অধিকাংশ গান গাইল মেয়েরা, ছেলেরা করল তার সঙ্গত। দুটী মেয়ে কয়েকটী ভাল নাচও দেখাল। আবৃত্তি হল কয়েকটি কবিতাও।

সকলের শেষে উঠল কবি। সে এগিয়ে গেল উপহার-রক্ষিত টেবিলটার কাছে। তারপর তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বের করল একটী ছোট বই—কবিগুরুর 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থ। বইটি খুলে সে পড়তে স্বরু করল স্বরচিত একটি কবিতা—স্মিতার দীর্ঘজীবন ও সুখ কামনা করে উপহার পৃষ্ঠায় লিখিত ঃ

জন্মদিন—
তব কাছে এই মোর আবেদন—
স্মিতার জীবন দ্বারে যেমনি এসেছ আজ তুমি,
তেমনি আসিও বারে বারে ;
আর শুধু দিয়ে যেও তারে—
প্রভাত-রবির আলোকিত প্রাণ।

পাঠান্তে সে বইটি দিল স্মিতার হাতে।

হাস্য-কণ্ঠে বলে উঠলো স্মিতা, চমৎকার প্রশস্তি! কবি, আমার স্বয়ংবর-সভায় তোমারই কণ্ঠে দেব আমার বরমাল্য।

উত্থিত হল উচ্চ-হাসির উতরোল।

*　　*　　*　　*

—স্মিতি, আমাকে আটকালে কেন—কব্জি-ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো প্রিয়রঞ্জন—রাত্রি অনেক হয়েছে, বলে ফেল—

—আজ-কাল তুমি আসো না কেন—সে কথার আগে কৈফিয়ৎ দাও—হাকিমী ভঙ্গীতে ঠিক হয়ে বসে বলে বসলো স্মিতা।

—বলেছি তো, সময় হয় না—মুখটাকে এড়িয়ে কী যেন এড়াতে চায় প্রিয়রঞ্জন।

—ও তো লেম এক্সকিউজ, সত্যি কথা বলবে না—

—ক্লাসে চীৎকার করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি; তারপর আর বেড়ানোর ইচ্ছে থাকে না—

—কিন্তু বাড়ীতে তো ক্লান্তি দূর করবার মতো কেউ নেই; বরং এখানে এলে তার কিছুটা সুরাহা হয়—ঠোঁট-প্রান্তে কিছু অনুযোগ কিছু অনুরাগ নিয়ে স্মিতা তাকাল তার চোখের দিকে।

—বেশ, এবার থেকে তাই করবো, এখন উঠি—প্রিয়রঞ্জন তাকালো ঘড়ির দিকে।

—আর একটু বসো—স্মিতার কণ্ঠস্বরে কোমল আবেদন।

কথাটা কিন্তু স্মিতা বলতে পারছে না; সে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

—কী বলবার এবার বলে ফেল—

—বিলেত যখন যাচ্ছ না, প্রফেসারী যখন পাকা; আর পরীক্ষার পর আমারো জীবনটা বড্ডো ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে, তখন বাকীটা আমাদের সেরে ফেলাই ভালো—

—বাকীটা কী—ক্যাবলাকান্তের মতো বলে বসলো প্রিয়রঞ্জন।

—আহা, কচি খোকা, কিছু বোঝে না—স্মিতার ওষ্ঠ-প্রান্তে দুষ্টুমি-ভরা স্মিত হাসি।

—সে আমি পারবো না—নীচু মুখে বললো প্রিয়রঞ্জন।

—পারবে না—স্মিতার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও কাঁপুনি।

—না—প্রিয়রঞ্জনের দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর।

না, কেন—ধরা গলায় বললো স্মিতা।

—কারণ পূর্বের প্রিয়রঞ্জন মারা গেছে—

চমকে ওঠল স্মিতা, কী বলছ প্রিয়, তুমি কী পাগল হলে নাকি—

—পাগল! হ্যাঁ, তা একটু হয়েছি বৈকী, তা তুমি বলতেও পারো—নির্বিকার চিত্তে বলে গেল প্রিয়রঞ্জন—সব পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়ে এসে শেষ পরীক্ষায় যার কাছে হলাম পরাজিত, সেই বিজয়িনীকে সারা-জীবনের সঙ্গিনী করতে পারবো না, আমার কাছে তোমার উপস্থিতি বর্শার ফলার মত আমার মর্মকে সর্বদা খুঁচে মারবে—এক নিশ্বাসে বলে ফেললো প্রিয়রঞ্জন।

—সেন্টিমেণ্টাল—একটু খোঁচা দিতে চাইল স্মিতা—দেখ, পরীক্ষাটা একটা লটারী, কার ভাগ্যে কখন কোন টিকেট ওঠে, তা তো বলা যায় না। আর তোমার কথাই ধরা যাক, তিনিটে পরীক্ষায় তুমি ফার্স্ট হয়েছ, মাত্র একটায় আমি; তাহলেও তুমি জয়ী, বড়জোর বলা যেতে পারে শোধবোধ হয়েছে। এতে মন খারাপ করার মত কিছু নেই—

—তোমার কাছে হয়তো নেই, আমার কাছে আছে—

—মানে, সামান্য পরীক্ষা নিয়ে ভালোবাসা নষ্ট হবে—এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। চার বছর ধরে সিনেমা-থিয়েটারে, রেঁস্তোরা-গড়ের মাঠে প্রতিটি সন্ধ্যা আমাদের কেটেছে, একদিন দেখা না হলে উৎকণ্ঠায় আমরা অস্থির হয়েছি, তার কী কোনো অর্থ নেই—

—সেদিন হয়তো তার একটা অর্থ ছিল, আজ নেই—

—নেই মানে, সামান্য পরীক্ষার ব্যাপারেই তোমার ভালোবাসা কর্পূরের মত উবে গেল ; কিন্তু আমি যে তোমাকে ভুলতে পারবো না—

—কলেজ-রোমান্স কী তোমার এখনও কাটে নি। ভালোবাসা আর ভোলা রিলেটিভ টার্ম ; তুমি বুদ্ধিমতী, বিদুষী, তা বোঝো। গৃহ ছেড়ে যখন বাইরে বেরিয়েছ, তখন পথ চলতে চলতে দু'চার জন পথিকের সঙ্গে দেখা তোমার হবেই। সেই পথ-চলিয়ে জীবনে কত লোকের সঙ্গেই না কথা বলতে হয় ; তারই মধ্যে কারো কাছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে দু'মিনিট কথা বলতে গিয়ে যদি একটু ঘনিষ্ঠতা ঘটে যায়, তাতেই বা কী আসে যায়—

স্মিতার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত রাগে গরম হয়ে গেল। তার কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠল। তার স্বর্ণাভমুখ রূপান্তরিত হল রক্তাভে। সে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি প্রিয়রঞ্জন তার সাঙ্গ ভালোবাসা নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করবে। তার হৃদয়ে যতোই আঘাত লাগুক বাইরে সে আর তার প্রকাশ পেতে দিল না এবং চাইল না এরপর প্রিয়রঞ্জনকে প্রেমনিবেদন করতে। সে বললো, থাক্, তোমার কাছে বিজ্ঞের মতো আর অর্বাচীন যুক্তি শুনতে চাইনা। তোমার যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে—

—হ্যাঁ, স্মিতি, যে বিয়েতে আমরা সুখী হতে পারবো না, সে বিয়েতে লাভ কী—

আগুনে যেন পড়লো ঘৃতাহুতি। দর্পিণী স্মিতা সর্পিণীর মতো ফোঁস করে ওঠলো, থাক্, থাক্, হিপোক্রাইট, এবার তুমি যেতে পারো—

নিঃশব্দে চলে গেল প্রিয়রঞ্জন।

আর স্মিতা ···

প্রিয়রঞ্জনের অপস্রিয়মান দেহের দিকে প্লাষ্টিকের পুতুলের মতো নিশ্চল হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রাত্রিটা বিনিদ্র কাটলো স্মিতার।

প্রিয়রঞ্জনের প্রত্যাখ্যানে স্মিতা আঘাত পেল বটে; কিন্তু ভেঙ্গে পড়লো না, আর ভেঙ্গে পড়ার মেয়েও সে নয়। তথাপি সে মর্মে অনুভব করল এক তীব্র আগুনের জ্বালা—যে আগুন পুড়ে মারে না, তিলে তিলে দগ্ধে মারে।

প্রিয়রঞ্জনের ওপর প্রতিশোধ নেবার ঈর্ষায় স্মিতা ঠিক করল সে বিয়ে করবে তারই একজন বন্ধুকে। তাই সে ডেকে পাঠাল পর পর একে একে অনেককেই; কিন্তু প্রত্যেকেই করল তার সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। তাকে জীবন-সঙ্গিনী করতে প্রত্যেকেই করল পশ্চাদপসরণ, প্রত্যেকেই দর্শাল আপন আপন স্বতন্ত্র কারণ।

অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম ব্যাঙ্কের কেরাণী বীরেন তাকে বলেছিল, তোমাকে বিয়ে করার সঙ্গে মেস ছেড়ে আমাকে উঠতে হবে বাসায়। তারপর রাখতে হবে ঠাকুর-চাকর। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর তুমিও পারবে না রান্না-বান্না করতে, তা পারাও তোমার উচিত নয়। আমার বিয়ে করা উচিত এমন একটী মেয়েকে যে 'কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড'রূপে সংসারের সব কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে পারবে। কারণ সংসার-জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন য়্যাড্‌যাষ্টমেণ্ট—পুরুষ করবে—অর্থোপার্জন, নারী দেখবে সংসার।

প্রত্যুত্তরে বিরক্তিতে স্মিতা তাকে বলেছিল, হায় বন্ধু, 'তব বাক্যে ইচ্ছি মারিবারে।' তোমার বধূ হবার আমার ডিসকোয়ালিফিকেশন তোমার সংসারে আমার কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড না-হতে পারা। তারপর তাকে উপদেশ দিয়েছিল নিজের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে একটা গেঁয়ো মেয়ে বিয়ে করতে, যে তার শুধু কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড হবে না, তার শ্রীচরণ ধরে নাকি বলবে 'দেহি পদবল্লভ মুদারম্।'

কিন্তু ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীর প্রথম ধনীর দুলাল ব্যারিষ্টার-নন্দন

হিরন্ময় তাকে দিয়েছিল নাটকীয় অথচ এক নিষ্ঠুর উত্তর—বিয়ে! তোমাকে! মাইরী, কী আহ্লাদের কথা। তোমার স্তাবকের সংখ্যা তো সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবের নাগালের বাইরে। তারপর তোমাকে বুকে ধারণ করতে গিয়ে কোন বুক-ভাঙ্গা প্রেমিকের গুলি এসে পড়ুক আমার বুকে।

এর উত্তরে ধৈর্য্যচ্যুত স্মিতার কর্কশ কণ্ঠে তাকে চলে যেতে বলায় সে 'মোর লাগি করিয়ো না শোক, হে বন্ধু বিদায়' বলে অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের এক অতি পরিচিত ভঙ্গীতে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

দর্শনের প্রথম শ্রেণীর প্রথম মহাদেব দাশগুপ্তের অজুহাত ছিল স্মিতার চেয়ে বয়সে সে ছোট আর সংস্কৃতের প্রথম শ্রেণীর প্রথম শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ছিল গোত্রের গণ্ডগোল; যার উত্তরে বিদ্রূপ কণ্ঠে সে মহাদেবকে উপদেশ দিয়েছিল দশ বছরের গেঁয়ো মেয়ে বিয়ে করতে আর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রামে গিয়ে টিকিতে তুলসী পাতা বেঁধে টোল খুলতে।

প্রিয়রঞ্জনের প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়েছিল স্মিতার, পরন্তু মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করার বাসনা জেগেছিল। তার দিনের শান্তি, রাত্রির নিদ্রা গেল টুটে। কী রকম একটা ভয়ানক অস্থিরতা নিয়ে সময় কাটাতে থাকে সে। তবুও সে এত সহজে হাল ছাড়তে চাইল না। সে শেষ চেষ্টা করলো।

এবং এই শেষ ব্যক্তিটি এমন একজন যে যোগ্যতায় ওদের তুলনায় অব্রাহ্মণ। পিতার দিক থেকে তার যেমন নেই বিত্ত, নিজের দিক থেকেও তার তেমনি নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব। এই রকেটীয় জঙ্গম জীবনে সে যেমনি অচল, এই রণধুন্ধর পৃথিবীতে সে তেমনি অসহায়। সে কবি কমল। এই দুর্ব্বল চিত্ত, সরল প্রাণ, মিষ্টভাষী সদাহাস্য, তরুণ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না এই বিশ্বাস তার হল।

স্মিতার কথা শুনে কমল যেন বিশ্বামিত্রের মত শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগলো স্মিতার বাড়ীর ছাদ থেকে নীচে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, স্মিতা বুঝি তার সঙ্গে তামাসা করছে ; তাই সে তাকে বল্লো—তুমি আমাকে অবাক করলে স্মিতা, আমি তো কল্পনায় কোনদিন ভাবতে পারিনি তোমার মত 'গিফটেড' মেয়ের পচ্ছন্দ এমনিতরো হতে পারে। প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর স্কলাররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটে তোমার নাম বেরিয়েছে, আর আমি লগি ঠেলতে ঠেলতে কোনরকমে তীরে ভিড়েছি। আর তুমি সেই আমাকেই কীনা বাছলে তোমার যোগ্য কনসর্ট : আমার মধ্যে তোমার উপযুক্ত যোগ্যতা আবিষ্কারের জন্য তোমার পচ্ছন্দকে তারিফ করি। সত্যিই তোমার পচ্ছন্দের মৌলিকত্বের বাহাবা না দিয়ে উপায় নেই—

—থাক, আর কাব্য করতে হবে না, আমাদের এনগেজমেণ্টটা তাহলে আজকেই বাবাকে জানিয়ে দিই—কমলের কথার মধ্যে যেন কোথায় সম্মতির সূত্র দেখতে পেয়ে স্মিতা এই কথা বলল।

— এনগেজমেণ্ট ! কীসের ! বিয়ের ··· কমলের কবিত্ব গেল ছুটে।

—তবে তোমার সঙ্গে কী আমি ইয়ার্কি করছি নাকি—স্মিতার কথার মধ্যে উত্তাপ দেখা দিল।

—আমি কিন্তু তাই ভেবেছি—হেসে বলে উঠলো কমল।

—তা ভাববে বৈকী, তোমরা পুরুষরা, সবাই কী সর্বদা মুখে মুখোস পরে থাকো—ভ্রুকুটি করে বলে উঠলো স্মিতা।

—তোমার মানস-যন্ত্রে কোন গোলমাল ঘটেছে মনে হয়—বিনয়ে বললো কমল।

—তা মনে হবে বৈকী, যতো সব হিপোক্রাইট ···

—আহা চটে ওঠছো কেন, তুমি তো জানো, তোমার চেয়ে আমি কত ক্ষুদ্র, তোমার কাছে আমি কত অযোগ্য ····

—থাক, থাক, আর বলতে হবে না—উত্তেজনায় স্মিতা কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঠোঁট বেঁকিয়ে, নাক সিঁটকিয়ে সে বলে যেতে লাগলো—কাপুরুষ, নিজেকে অতো ছোট ভাবো কেন। না, শুধু তুমি নও, তোমরা নও, সমগ্র হিন্দুজাতটাই কাপুরুষ; নইলে সতেরজন অশ্বারোহী বাঙলা জয় করে; ইংরেজ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করে, ভারতের আয়তন ক্রমশঃ কমে যায়। কাপুরুষের দল, তোমরা নিজেরা দলে দলে হয়েছ মুসলমান, হয়েছ খৃষ্টান, হাজার হাজার মেয়ে পাঠিয়েছ বিধর্মীর হারেমে। এইভাবেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে একদিন তোমাদের অস্তিত্বের ঘটবে বিলুপ্তি। যাও, চলে যাও, তোমাদের কাউকে আমি চাই না; কাপুরুষের দল, তোমারই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেরা রত্ন, বাঙলার মুখপাৎ সন্তান ...

তার চোখে মুখে সারা অঙ্গে ফুটে ওঠল এক প্রলয়ংকরী রূপ—সে যেন মহাপ্রলয়কারিণী সেই মহাশক্তি, যার প্রকোপে ধ্বংস হয়ে যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সে নয় স্মিতা, লাস্যময়ী স্মিতা; সে নয় বান্ধবী, প্রিয়-বান্ধবী।

আর, তার সেই প্রলয়ংকরী মূর্তির সামনে কমলের অবস্থা হয়ে উঠল বাঘের জল ঘোলাকারী হিতোপদেশের সেই অসহায় মেষ-শাবকটির মতো। কেঁচোর মতো কুঁচকে এতোটুকু হয়ে গেল সে। ভয়-চকিত শিশুর মতো যেন হামাগুড়ি দিয়ে প্রাণটি হাতে করে কোনমতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর গড়াতে গড়াতে কী ভাবে কখন যে ফুটপাতে এসে পড়লো, সে যেন তা নিজেই জানে না।

আর স্মিতা ...

মহাপ্রলয় ক্লান্ত মহাশক্তির মতো সে যেন ক্লান্ত, মরুহরিণীর শূন্যতা তার চোখে-মুখে! সে কম্পিত অবস্থায় এলিয়ে পড়লো একটা কোচে।

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে দেখতে লাগলো নানা স্বপ্ন—কত অসম্ভব কাহিনী, কত সম্ভব ঘটনা—সবই অসলগ্নভাবে : প্রিয়রঞ্জন আর সে ইডেন গার্ডেনে মুখোমুখি বসে গল্প করছে, কমল তার প্রশস্তি গেয়ে কবিতা শোনাচ্ছে ; সে আর কমল পালঙ্কে পাশাপাশি বসে আছে, আজ তাদের ফুলশয্যা, কিন্তু কমল মিছিমিছি তার সঙ্গে ঝগড়া করে মধুরাত্রিকে মাটি করে দিচ্ছে, হিরন্ময় ইংলণ্ডের এক নির্জন সমুদ্র-সৈকতে একটি ইংরেজ তরুণীর হাত ধরে বেড়াচ্ছে, প্রিয়রঞ্জন বরুণা সেনকে নিয়ে মেট্রোয় ঢুকছে, প্রিয়রঞ্জন, বীরেন, হিরন্ময়রা ড্রয়িং রুমে তুমুল তর্ক তুলেছে, একজন চেনা-চেনা যুবক তার ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করছে ···

আতঙ্কে তার ভেঙ্গে গেল ঘুম। উত্তেজনায় সে উঠে বসল বিছানায়। সারা দেহে তার ছুটছে ঘাম। সবুজ আলোয় সে দেখতে পেল, না কোথাও কিছু নেই। সে বুঝল—এ শুধু স্বপ্ন। কিন্তু কেন এ স্বপ্ন ··· ভাবতে লাগল সে। একটু পরেই তার মানস-মুকুরে ভেসে উঠল একটি পরিচিত মুখ—সে মুখ হরষিৎ মুখার্জীর, স্কটিশ চার্চ কলেজে তার সহাধ্যায়ী।

মনে পড়ল তার হরষিতের করুন মৃত্যু-কাহিনীটি।

একদিন যখন সে কলেজ থেকে বেরিয়ে বাড়ী আসার জন্য 'কারে' চড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় হরষিৎ তাকে তার প্রেম-নিবেদন করে বলেছিল, স্মিতা, তোমাকে ··· তোমাকে আমি নিজের করে পেতে চাই। তার উত্তরে সে নিজের পরণের শাড়ীটা দেখিয়ে বলেছিল, এটার দাম যা, তাতে তোমার পাঁচ-ছ'মাস বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। আমাকে পাবার লোভ ত্যাগ কর। তুমি ভালছেলে, ভালভাবে পাশ কর, বাবাকে বলে বরং একটা চাকরী জুটিয়ে দেব।

সেইদিন রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে হরষিৎ আত্মহত্যা করেছিল।

স্মিতার মনে অনুশোচনা দেখা দিল। তাকে যদি সে অতো নিষ্ঠুর আঘাতটা না দিত। আহা! আজ যদি সে বেঁচে থাকতো ··· না, সেও একটা কাপুরুষ, একটা মেয়ের জন্য আত্মহত্যা করল ···

এসব বাজে চিন্তা না করে সে আবার শুয়ে পড়লো।

এরপর স্মিতা আর কাউকে ডাকলো না; আর ডাকবেও না ঠিক করল। কিন্তু সে কী করবে—তাও সে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

দিন চলে যায়; কিন্তু সময় যে তার কাটতে চায় না। চব্বিশ ঘণ্টাকে তার মনে হয় চুরাশি ঘণ্টা, এক মাসকে মনে হয় এগার মাস। ইচ্ছে করেই সে সকাল ন'টা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকে; দুপুরের সময় শুয়ে শুয়ে নাটক-নভেলের পাতা ওল্টায়, কিন্তু পড়তে পারে না। বিকেলে মোটর গাড়ীতে গড়ের মাঠে চক্র দিয়ে বেড়ায়, কিন্তু মন সুস্থ হয়ে ওঠে না। সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে, কিন্তু চিত্ত তার উৎফুল্ল হয়ে উঠে না!

ক্রমে ক্রমে সে দুশ্চিন্তা-রোগগ্রস্তা হয়ে পড়লো। তার মেজাজ হল খিটখিটে। কিছুই তার ভাল লাগে না। আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ কোনটাই তার মনের মত হয় না; আর কেমনটা হলে ভালো হয়, তাও সে জানে না। তরকারী যাচ্ছেতাই হয়েছে বলে খেতে খেতে সে ওঠে পড়ে, ঠাকুরকে দেয় বকুনি। ঠিক শাড়ীটা হাতের কাছে পাচ্ছেনা বলে চাকরকে দেয় ধমকানি। মিসিবাবার রাগের কারণ তারা বুঝতে পারে না, ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, নতুবা মাথা নীচু করে তার সামনে থেকে সরে পড়ে।

ক্রমে তার স্বাস্থ্যের ভাঙ্গনও সুরু হল। তার চোখ গেল বসে—চোখের কোণে পড়লো কালো দাগ, নিটোল গণ্ডে দেখা দিল টোল। অকুঞ্চিত কপালে দেখা দিল বলিরেখা।

নিজের স্বাস্থ্যের ভাঙ্গন বুঝতে পেরে স্মিতা ভয় পেয়ে গেল। স্বাস্থ্য

পুনরুদ্ধারের ও মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করবার উদ্দেশ্যে সে ভ্রমণে বেরোলো। পুরী, রামেশ্বর, বোম্বে রাঁচি হয়ে মাস দুয়েক পরে সে যখন বাড়ী ফিরল; তখন তার স্বাস্থ্য ফিরল বটে; কিন্তু মনের দুশ্চিন্তা কাটল না। তার এই সুদীর্ঘ একক ভ্রমণ পথে অনুক্ষণ সে একটা কীসের অভাব অনুভব করতো আর অনেক সময় সে মনে করতো এই ভ্রমণপথে যদি তার একজন পুরুষ সঙ্গী থাকতো।

দুশ্চিন্তার ঘূর্ণিপাকে পাক খেতে খেতে স্মিতা পিতার উপর এসে পড়লো—উদাসীন পিতার উপর তার সব রাগ পড়লো। এতোদিন না হয় সে পড়াশোনা নিয়ে ছিল; কিন্তু এখন তো নেই, বাবার কী বারেক মনে হয় নি তাঁর মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। মক্কেল আর ব্রীফ ছাড়া পৃথিবীর সব জিনিষের প্রতি যিনি নিদারুণ উদাসীন, তাঁর চক্ষে তাঁর বিদুষী কন্যার বিয়ে কখনো বড় হয়ে ওঠে না। মনে পড়ে তার মায়ের কথা। মা যদি আজ বেঁচে থাকতো, সে বুঝতে পারতো তার মেয়ের কষ্টের কথা; বাবাকে বলে তাঁর মেয়ের বিয়ের একটা বিহিত করে ফেলতো। মায়ের কথা মনে পড়ায় তার দুচোখ বেয়ে নেমে আসে জল।

চিন্তার আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে আবার কখনও ভাবে পোষ্ট বক্সের নম্বর দিয়ে খবরের কাগজে 'পাত্র চাই' বলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা।

··· না, তাও সে পারে না। সে কী সরকারী ডিসপোজ্যালের মাল যে বিজ্ঞাপন দিয়ে খদ্দের যোগাড় করতে হবে ···

··· যদিও বা তা করা যায় কিন্তু তার পানিপ্রার্থীরা অধিকাংশই হয়তো হবে প্রিয়রঞ্জন-হিরন্ময় মার্কা। তারা তাকে দেখবে, নানা প্রশ্ন করবে; তারপর পছন্দ হয় গ্রহণ করবে—তাও প্রচুর অর্থসহ, নয়তো চলে যাবে। না ··· না ··· সে নিউ মার্কেটের খেলনা-পুতুল নয়, খদ্দেররা তাকে যথেষ্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পছন্দ করবে। নারীত্বের,

আত্মসম্মানের এতোবড়ো অবমাননা সহ্য করে সে কোন পুরুষেরই ঘরণী হতে চায় না। এ তার পক্ষে অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব ...

... তবে কী সম্ভব ... তা সে ঠিক করতে পারে না, ভাবতেও পারে না ..

কিন্তু সে চায় একজন জীবন-সঙ্গী, একজন প্রেমিক-পুরুষ ...

এমনি সময়ে সে একদিন পেল প্রজাপতি-মার্কা একটা নিমন্ত্রণ পত্র। প্রজাপতির ছাপ দেখেই সে বুঝতে পারলো কারো বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। তার মনটা ক্যামন হয়ে গেল। খামটা খুলে চিঠিটা পড়লো। চিঠি পড়ে রাগে তার মাথা ঘুরতে লাগল।

প্রিয়রঞ্জনের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র।

চিঠিটা সে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। তার মনে হল প্রিয়রঞ্জন তার সঙ্গে বিদ্রুপ করতে চায়, তামাসা করতে চায়। তাকে প্রত্যাখ্যান করে সে অন্যকে বিয়ে করতে যাচ্ছে—আর সেই বিয়েতে তাকে করেছে নিমন্ত্রণ, আর তাকে যোগদান করতে হবে তাদের হনিমুনে।

রাগে তার গায়ের চুল নয়, মাথার চুলও যেন দাঁড়িয়ে গেল।

আজ প্রায় এক বছর হল যার সঙ্গে সে দেখা-সাক্ষাৎ চিঠিপত্র একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে—অর্থাৎ যার সঙ্গে সে সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছে তাকে হঠাৎ বিয়ের নিমন্ত্রণ কেন ...

স্মিতার মনে হল তাকে স্রেফ অপমান করার জন্যই এই নিমন্ত্রণ।

না, সে যাবে না নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

কিন্তু সে আধুনিক যুগের নাগরিক ভদ্রমানুষ। তাই সে ঠিক করল চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবে শরীর অসুস্থের জন্য সে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারল না। প্রিয়রঞ্জন যেন তাকে ক্ষমা করে।

কিন্তু প্রিয়রঞ্জনের বৌ-ভাতের দিন বিকেলে স্মিতা বেশ সেজেগুজে

গাড়ীতে চেপে বসল। বহুদিন সে নিজেকে এমন অপরূপ রূপসজ্জায় সজ্জিত করেনি। নিউ মার্কেটে গিয়ে ভালো দেখে একটা প্লাস্টিকের পুতুল কিনল। তারপর গাড়ীতে চেপে তা চালাল শ্যামবাজারের দিকে এবং গিয়ে থামল প্রিয়রঞ্জনের বাড়ীর সামনে।

প্রিয়রঞ্জন করিয়ে দিল বধূর সঙ্গে স্মিতার পরিচয়।

প্রিয়-বধূর নাম মেঘমালা।

প্রিয়রঞ্জনের 'মালা'টী দেখে স্মিতা যেন পড়ে গেল মেঘলোক থেকে। মেঘমালা গায়ের দিক থেকে মেঘের মতোই কালো—আলাপে স্মিতা বুঝল মনের দিক থেকেও সে তথৈবচ। মেঘমালা নামটি হঠাৎ যেমন তাকে গুপ্তযুগের মেয়ে বলে স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু সে কালিদাসের 'চিত্রলিখা মন্দালিকা মালবিকা'দের কেউ নয়। অর্থাৎ সে যেন মধ্যযুগের একটি মেয়ে, বিংশতিয়া আধুনিকা নয়।

মেঘমালার কোলে পুতুলটি দিয়ে স্মিতা অর্থপূর্ণ মিহি হাসি হাসলো। তারপর বিদায় নিয়ে চলে এলো।

এরপর পুরুষ জাতের প্রতি স্মিতা একেবারে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল।

না, এরা একেবারে ভেড়ার দল। পছন্দ-অপছন্দ বলে কোন জিনিষ এদের নেই, ভালো-মন্দের কোন মাত্রাজ্ঞান নেই; বিয়ে করতে হয় বলেই যেন বিয়ে করে। মেয়ে হলেই হল, সে যেমনই হোক! তা না হলে প্রিয়রঞ্জন তাকে পরিত্যাগ করে মেঘমালার মতো মেয়েকে বিয়ে করে! আর এই প্রিয়রঞ্জনকে পাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ছি ··· ছি ···! নিজের ওপর তার একটা ধিক্কার এল। ভাগ্যে সে এদের কাউকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেনি, বেঁচে গেছে! না, সে আর বিয়ে করবে না, পুরুষ জাতীর অধীন সে হবে না। সে থাকবে মুক্ত, বিহঙ্গের মতো মুক্ত।

কিন্তু শুধু নিজে একা মুক্ত থাকলে চলবে না। সমগ্র নারী-

জাতিকে মুক্ত করতে হবে। বিয়ে করে নরের অধীন থাকাই নারীর শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। সেই অপরাধ থেকে নারীজাতিকে রক্ষা করতে হবে, বর্বর পুরুষদের হাত থেকে নারীকে বাঁচাতেই হবে ···

কিন্তু তার পক্ষে কী করে তা সম্ভব ···

সে শুধু ভাবতে থাকে ···

আর এই ভাবনাই হয়ে ওঠল তার দিবসের চিন্তা. রাত্রির স্বপ্ন।

এমনি সময়ে সে একদিন খবরের কাগজে দেখতে পেল তার মনোমত একটী বিজ্ঞাপন—সর্বভারতীয় নারী আত্মত্রাণ সমিতির কলিকাতা শাখার জন্য একজন টুরিষ্ট-সেক্রেটারী প্রয়োজন। প্রার্থী অভিজাত, উচ্চশিক্ষিত, অত্যাধুনিক এবং অবিবাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়!

হঠাৎ যেন স্মিতা তার স্বপ্ন ও সাধনার ধন হাতে পেয়ে গেল।

নারী-মুক্তির জন্য সে নারী আত্মত্রাণ সমিতির ভ্রাম্যমান সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করবে। তারপর সারা বাঙলাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষময় সে নারী-আন্দোলন করে বেড়াবে, নারীকে জাগিয়ে তুলবে: সমগ্র নারীসমাজকে একত্রিত করবে, তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনবে: নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার এনে দেবে। নারী থাকবে না আর নরের অধীন, সমাজের বন্দিনী। বরং নরকে করে তুলতে হবে নারীর অধীন, সমাজকে পরিচালিত করতে হবে নারীর দ্বারা। নারীই হবে নেত্রী, সমাজ-বিধায়ক—বংশ-পরিচয় থেকে সুরু করে সমাজ-রাষ্ট্র-পরিচালন; আবার স্থাপন করতে হবে ম্যাট্রিয়ার্কাল ফেমিলি অব্ সোসাইটি। একদিন ত তাই ছিল। সেদিন নারী ছিল সমাজের নেত্রী, সমাজে ছিল তার সর্বময় আধিপত্য। তার নির্দেশে নির্ধারিত হত সমাজ-জীবন—সন্তানের পরিচয় থেকে সুরু করে সমাজের শৃঙ্খলবোধ। সেদিন পুরুষের ছিল না কোন আধিপত্য—সে ছিল যাযাবর। যাযাবর পুরুষ তার ভ্রমণপথে যখন

যেখানে যে নারীর সাক্ষাৎ পেত, তখনই তার সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আবার সরে পড়তো। তাই জননী নারী প্রথম বাঁধে নীড়, পাতে সংসার, গড়ে সমাজ। ফলে তার ছিল একছত্রাধিপত্য। কালক্রমে ম্যাট্রিয়ার্কাল ফেমিলি হল বিলুপ্ত, উদ্ভব হল প্যাট্রিয়ার্কাল ফেমিলি। নর হল সর্বময় কর্তা। সে নারীকে করল অধীন, তাকে বন্দী করল গৃহ-মধ্যে, স্থান করে দিল তার শয়নকক্ষে আর রান্না-ঘরে। নারীকে দেখতে সে সুরু করল ভোগের সামগ্রীরূপে, তার কামব্যবসায়ের পণ্যরূপে। বিয়ের ধাপ্পায়, সতীত্বের ধাপ্পায় সে নারীকে নিয়ে খেলেছে যথেচ্ছ ছিনিমিনি। স্বার্থপর পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্টি করল নানা আইন, নানা কানুন। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে এই বর্বরতা বেড়েছিল চরমে। তাই ভারতবর্ষে পাপ জমেছে এতো জমাট হয়ে।

ভারতবর্ষকে পাপশূন্য করা মানে পুরুষের হাত থেকে ভারতীয় নারীদের মুক্ত করা। পশ্চিমের নারী এ দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রাচ্যের নারীকেও এগোতে হবে। কিন্তু সে পথ বড় সংগ্রামসঙ্কুল। নারীর ওপর শত শত বৎসরের কায়েমী ভোগদখলটা এতো সহজে পুরুষ ছেড়ে দেবে না। তাই 'হিন্দু কোড বিল' পাশে 'গেল গেল' রব। সেজন্য চুপ মেরে থাকলে নারীর চলবে না। সমগ্র শক্তি দিয়ে নারীকে তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এই বৃহৎ সংগ্রামের জন্য চাই বৃহৎ নেতৃত্বও। স্মিতা ঠিক করে ফেলল—নারীর মুক্তির জন্যই সে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে, এই সংগ্রামের নেতৃত্ব নেবে। সমগ্র ভারতবর্ষময় ঘুরে ঘুরে সে নারী-আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে। নরের হাত থেকে সে নারীকে মুক্ত করবেই।

এক্ষুনি তাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। সেক্রেটারীর পদটা তাকে নিতেই হবে।

বেশ-বিন্যাস ঠিক করে কাগজটা হাতে নিয়ে তরতর করে স্মিতা

নীচে নেমে এলো। সোফারকে না ডেকে নিজেই গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিল। তারপর দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটাল।

গাড়ীটা যেন ডানা বেঁধে উড়তে লাগলো: রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে বাজপাখীর মতো ডিগবাজী খেয়ে যেন উড়ে গেল কোন এক সুদূর শূন্য দিগন্তে ···

আর স্মিতার মনও এক গৌরবময় মোলায়েম আত্মপ্রসাদে উড়ে চলেছে বহুদূর শতাব্দীর পরের এক যুগে ···

··· বহুযুগ পরে যখন পৃথিবীতে আবার ম্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবে—সেদিনের পৃথিবীর বিশেষ করে ভারতের নারিগণ স্মরণ করবে তার কথা, বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করবে তার মর্মর মূর্তি, তার জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথিতে তার মর্মরমূর্তিগুলিতে পুষ্পমাল্যভূষিত করে তার প্রতি তাদের অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে, আর সভা-সমিতি করে বলবে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে যে নারীমুক্তি আন্দোলন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল, তার পুরোধা ছিলেন এই মহীয়সী রমণী—'নারীমুক্তিদাত্রী' স্মিতা বোনার্জী ···